ডঃ নলিন প্যাটেল

শ্রদ্ধাস্পদেষু

অনুবাদকের অন্যান্য বই

কবিতা :

শেষ অন্ধকার প্রথম আলো
মৃত্যুদিন জন্মদিন
আজ বসন্ত
স্বপ্নের উদ্যান ছুঁয়ে
পটভূমি কম্পমান
জন্মে প্রতিজন্মে
যেতে যেতে

প্রবন্ধ :

প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য

সম্পাদিত :

সূর্যের প্রতিবেশী (নিগ্রো কবিতা)
ষাটের কবিতা

অনুবাদ :

জলপাই অরণ্যে প্রতিদিন (প্যালেস্টাইনের কবিতা)
শতপুষ্প (আধুনিক হিন্দী কবিতা)
আরবের গল্প (যন্ত্রস্থ)

উপন্যাস :

ভোরের বৃষ্টি (যন্ত্রস্থ)

শিশু ও কিশোর সাহিত্য :

রূপকথা নয়
মৃত্যুত্তীর্ণ
অমৃত সমান
অন্বেষা
নদীর ওপারে

ইংরেজী :

Some Poems
Beside a Secret River (Poems)
Points of View on
Afro-Asian Literature (Essays)

'শিলাদিত্য' পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের কাছ থেকে উপন্যাসটি বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়। তখনই ইচ্ছে ছিলো, গ্রন্থাকারে বইটি প্রকাশ করার। বন্ধু মৃদুল চ্যাটার্জীর আন্তরিক সহযোগিতায় তা সম্ভব হলো। তাঁর কাছে রইলো আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা।

পড়ার মতো তেমন কিছু নেই। অথচ বিছানার পাশেই তাকে স্তূপীকৃত পড়ে আছে অনেক বই। তার সব ক'টিই সে একাধিকবার প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে পড়েছে। অলস ভঙ্গিতে একটি বই সে তুলে নিলো তাক থেকে। বইটি একজন ইন্দ্রিয়পরায়ণ সুন্দরী সম্পর্কে, যে দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য নিজ সাম্রাজ্য পর্যন্ত বেচে দিতে চেয়েছিলো। তিন-চার পৃষ্ঠা পড়ার পরেই রেখে দিলো বইটি বিছানার এক পাশে। অদ্ভুত ক্লান্তিতে দু'চোখ বুঁজে এলো তার।

বন্ধ জানালার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস যেন হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকছে।

নির্জনতা যেন বহু শব্দের এক আশ্চর্য ঐকতান। সে ভাবলো, এমন কোনও জায়গা নেই, যেখানে শব্দবিহীন নির্জনতা বিরাজমান। এখন চারদিকে ছড়িয়ে আছে এমনি এক শব্দময় নির্জনতা। কাঠের ঘুণে ধরা পুরোনো ছাদ থেকে সবিরাম ধুলো পড়ছে। মৃদু ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ। অনেক দূরে গাছের পাতায় পাতায় ঘর্ষণের শব্দও হয়তো শোনা যেতে পারে। কিন্তু সে কি এ-সব শুনছে না? নাকি শুনছে, দূরে কোথাও ঝিঁঝিঁর অবিরাম ক্রন্দন? এ যেন তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, তুলা[১] বর্ষায় স্নাত বিষাদময় সুপুরি বাগানের ঝিরঝির শব্দ। কুমায়ূন পাহাড়ে এ কখনও সম্ভব নয়। যদিও উজ্জ্বল সূর্যালোকেও এখানে ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যায়।

নয় বছর ধরে সে প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে শিক্ষকতা করছে। কিন্তু এখনও সে ঝিঁঝিঁর স্বভাব বা জন্মস্থান সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

· কুমায়ূন পাহাড়ে, প্রকাশ্য দিবালোকে ঝিঁঝিঁরা তীব্র চিৎকারে···

[১]কেরালায় দু'বার বর্ষা হয়। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে যে বর্ষা হয়, তাকে বলা হয় তুলা বর্ষা।

ফিল্যাম্...এবং ক্লাশ....? হায় ঈশ্বর! এ-সব কি এলোমেলো চিন্তা মনে আসছে!

কুয়াশা হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকছে। তাতে ডুবে যাচ্ছে নির্জনতার সঙ্গীত।....সে উঠে বসলো। দরজায় কে যেন ঠক্ ঠক্ শব্দ করছে।

কতক্ষণ সে ঘুমিয়েছিলো? ঘরে তো কোনও কুয়াশা ছিলো না। তার চোখ বন্ধ ছিলো; তার উপরে ছড়ানো ছিলো ঘুমের আবরণ।

দরজায় আবার ঠক্ ঠক্ শব্দ শোনা গেলো। কাঠের ঠাণ্ডা মেঝে অতিক্রম করে সে গিয়ে দরজা খুলে দিলো। ভেবেছিলো, হয়তো অমর সিং। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলো রেশমী বাজপেয়ীকে।

তার মনে পড়লো, গত দু'দিনে ছাত্রাবাসের সকলেই চলে গেছে। কেবল বাদ ছিলো রেশমী। রেশমী তাকে দেখেই বলে উঠলো—

'মিস! আমি যাচ্ছি।'

'আচ্ছা।'

রেশমীর পরনে ছিলো গাঢ় নীল রঙের কারডিগ্যান। বোতামগুলো সব খোলা। টোল খাওয়া গাল। কপালে বড় কালো টিপ। যেন যৌবন-মদে মত্তা চোখ দু'টি আনন্দে নৃত্য করছে। বয়সের তুলনায় তাকে বড় দেখায়। রেশমী নিজেও এ-ব্যাপারে বেশ সচেতন। হয়তো তাই এই প্রচণ্ড শীতেও কারডিগ্যানের বোতাম আটকায়নি।

'এখন কি তোমার বাড়ি যাবার কোনও বাস আছে?' ছাত্রাবাসের তেতাল্লিশ জনের দায়িত্ব রয়েছে তার উপর।

'আছে—হালদানি পর্যন্ত।'

'সেখান থেকে?'

রেশমীর চোখে কি কোনও গুপ্ত পরিকল্পনার দীপ্তি দেখা যাচ্ছে? তার চোখের পাতা কি অস্বাভাবিক মাত্রায় ওঠা নামা করছে?

'সেখান থেকে—মিস—অন্য বাস আছে। বাবা কাউকে নিশ্চয়ই সেখানে পাঠাবেন।' বলতে গিয়ে রেশমীর বাদামী গালের আভা মুহূর্তের জন্য যেন মুছে গেলো।

'ঠিক আছে।' বলে বারান্দায় পা রাখলো সে। গাড়ি-বারান্দার প্রধান প্রবেশ পথে একটি যুবককে দেখতে পেলো সে। যুবকটি নোটিশ বোর্ডের দিকে তাকিয়ে কি যেন পড়ছে।

'তোমার জন্যে কে এসেছে রেশমী?' তার কণ্ঠস্বর-একটু অন্য রকম শোনালো। রেশমী এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বললো—

'আমার দাদা।'

যুবকটি ঘুরে দাঁড়ালো। বিমলা এবার তার মুখ দেখতে পেলো। চোখ দু'টি তার ধূসর। বিমলা রেশমীকে জিজ্ঞেস করবে ভেবেছিলো, এমন চোখ তার দাদা কি করে পেয়েছে। রেশমীর ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে আর জিজ্ঞেস করতে পারলো না। নির্লিপ্তভাবে বললো—

'ঠিক আছে, যাও।'

'নমস্তে, মিস।'

'নমস্তে।'

চার পাঁচ পা এগিয়ে গিয়ে ফিরে তাকালো রেশমী এবং মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলো—

'মিস! আপনি কবে যাবেন?

'আগামীকাল।'

এখন কোনও কিছু না ভেবেই সে এ-রকম উত্তর দিয়ে থাকে। মেয়েরা বাড়ি যাবার আগে সর্বদাই এ-রকম ভাবে প্রশ্ন করে। আবার বাড়ি থেকে ফিরে এসেও ঠিক এ-ভাবেই জিজ্ঞেস করে, 'মিস! কবে ফিরলেন?' কখনো বিমলা এর উত্তর দেয় না। আবার কখনো হয়তো বলে: 'গতকাল।'

পাহারাওলা অমর সিং তার সে-সব উত্তর শোনে। কিন্তু এতে তার মুখে কোনও প্রতিক্রিয়ার ছাপ পড়ে না।

এ-ভাবেই আগামীকাল ও গতকালের মধ্যে পিছলে যায় তার ছুটির দিনগুলি। পিছলে গিয়েছে তার জীবনের অনেক বসন্ত—অনেক বছর।

তার ছাত্রীরাও অবশ্য জানে, তাদের রেসিডেণ্ট টিউটর মিস বিমলা

কোনও ছুটিতেই বাড়ি যান না। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ তাকে এর কারণ জিজ্ঞস করেনি। এটা ছিলো তার বড় সান্ত্বনা।

রেশমীর চামড়ার সুটকেস পিঠে নিয়ে কালো কোট পরা ভুটিয়া ছেলেটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো। তার পেছনে ধূসর চোখের যুবকটি। তার পেছনে মাথা নিচু করে চলে গেলো রেশমী বাজপেয়ী।

আচ্ছা, রেশমী কি আজ রাতে বাড়ি ফিরতে পারবে? তার বাড়ি যাবার বাস কাল সকাল সাড়ে সাতটায় ছাড়বে।

বিমলার মনে পড়লো, হালদানির টুরিস্ট বাংলোর কথা। রেশমীর গালে যে উজ্জ্বল আভা এবং চোখে যে চাপল্য সে লক্ষ্য করেছে, তা বোধ হয় রাতে ওই বাংলোয় অবস্থানের কথা ভেবেই।

রেসিডেন্ট টিউটর হিসেবে বিমলা হয়তো গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ীকে টেলিগ্রামে জানাতে পারতো : 'রেশমী বাড়ি যাবার জন্য সাড়ে তিনটার বাসে হালদানি রওনা হয়েছে।'

এই টেলিগ্রাম পাবার পর পরিবারে কি রকম অশান্তির ঝড় উঠতে পারে, মনে মনে তার একটা ছবি আঁকলো বিমলা। ক্রুদ্ধ অভিভাবকদের সামনে ভীত-সন্ত্রস্ত রেশমী থর থর করে কাঁপছে। মন থেকে ছবিটা মুছে ফেলে বিমলা। ভাবে, এতটা নিষ্ঠুর হওয়া অনুচিত।

সে তাকিয়ে দেখতে থাকে, পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা পথ ধরে মেয়েটি নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। সঙ্গে সেই যুবকটি। তারপর যখন গাঢ় নীল রঙের কারডিগ্যান পরা মেয়েটি বার্চ গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো, তখন বিমলা উত্তেজনা প্রশমন করে মনে মনে উচ্চারণ করলো, 'রেশমী! ভেবো না আমাকে বোকা বানাতে পেরেছো।'

রেশমীর বয়স মাত্র ষোল। কিন্তু এর মধ্যেই রীতিমতো মহিলা বনে গেছে সে।

বিমলা তার ঘরে ফিরে এলো। সকালের ছাড়া জামা-কাপড় সব মেঝেতে এলোমেলো পড়েছিলো। ভাবলো, গুছিয়ে রাখবে। ছাদের ঘুণে-খাওয়া কাঠের গুঁড়ো ঘরময় ছড়িয়ে আছে। দেওয়ালে আটকানো

টবে কাগজের ফুলের উপর যেন ধুলোর আবরণ। আসল রঙ প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। ক্যালেণ্ডারে এখনও জানুয়ারী মাস। আচ্ছা, আজ কত তারিখ? এপ্রিলের এগার।

নতুন বছর যেন ঠাণ্ডায় জমে স্থির হয়ে আছে ক্যালেণ্ডারে। বিমলা একটা জানালা খুলে দিলো। ঠাণ্ডা বাতাস হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে যেন অপরাধীর মতো থমকে দাঁড়ালো।

টিলার নিচে বোর্ডিং হাউসের বাইরে একটা ছোট কুঁড়ে ঘর আছে। বিমলা দেখলো, একটি নেপালী ছেলে সেখানে কাজ করছে। এটি তৈরি করা হয়েছিলো ভ্রমণের মরসুমে ট্যুরিস্টদের ভাড়া দেবার জন্য। আলমোড়ার একজন ধনী ব্যক্তি এর মালিক ছিলেন। তাঁর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এর নাম ছিলো 'চন্দ্রকান্ত'। তারপর ওঁর ছোট ছেলে মালিক হয়ে এর নাম পাল্টে দেয়। যে বছর বিমলা এখানে রেসিডেন্ট টিউটর হিসেবে যোগ দেয়, সে বছরই 'চন্দ্রকান্ত'র নাম পাল্টে হয় 'গোল্ডেন নূক'।

বাইরের আকাশটা কেমন যেন বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। পাহাড়ের ঢালু জায়গায় পাইন বনে কুয়াশা ঘুরে বেড়াচ্ছে এলোমেলো ভাবে। ডিসেম্বরের বিকেলে সে প্রায়ই এই জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকিয়ে দেখে বরফের মেলা। যতদূর দেখা যায়, শুধু বরফ আর বরফ। পৃথিবীর সমস্ত শরীর যেন বরফের আস্তরণে ঢাকা পড়ে যায়।

তারপর যখন শীত কমে আসে তখন বরফের বুক চিরে কোথাও কোথাও ভেসে ওঠে সবুজিমা। সবুজ আর রূপালী রঙের তখন চারদিকে সে কী ঝিল্‌মিল্। শেষ পর্যন্ত এখানে সেখানে শাদা মেঘের মতো পড়ে থাকে বরফের ফলক। বিগত শীতের আবছা স্মৃতির মতো।

কয়েক মাস শীত ভোগের পর আবার পাহাড়গুলি যেন গ্রীষ্মের বিকেলে নিজেদের শরীর উত্তপ্ত করে নেয়। যখন প্রচণ্ড রোদ ওঠে, তখন বরফ গলে ছোট ছোট ঝর্ণার মতো নিচে গড়িয়ে পড়তে থাকে।

বিগত দিনের অশ্রুর মতো।

দেখতে দেখতে আকাশটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেলো। পড়ন্ত বিকেলের রক্তিম আভায় যেন অবগাহন করতে লাগলো প্রসারিত পর্বতমালা। পাহাড়ের ঢালু জায়গায় বার্চ গাছের পাতায় পাতায় লেপ্টে থাকা বরফের গায়ে লাল রোদ্দুর ঝলমল করে উঠলো। দূরের বরফ-শাদা পাহাড় চূড়ো, যা এতক্ষণ হিমেল মেঘে আচ্ছন্ন ছিলো, তাও যেন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এই বোর্ডিং হাউসের তেইশটা ঘরের মধ্যে এই ঘরটাই একদিক থেকে সৌভাগ্যবতী। কারণ, এ ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়েই বরফ মাখা পাহাড় চূড়োয় রোদের লুকোচুরি খেলা দেখা যায়। বিমলা মনে-প্রাণে তা উপভোগ করে।

ঘরটার দুর্নাম দিয়ে গেছে পুষ্প সরকার। বিমলার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিলো, যখন সে স্কুল-অফিসে পদত্যাগপত্র পেশ করে বেরিয়ে আসছিলো। কে যেন ওর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো বারান্দায়।

বোর্ডিং হাউসের সকলের মুখেই সেদিন ছিলো পুষ্প সরকার সম্বন্ধে আলোচনা। সেই কুখ্যাত পুষ্প সরকার নাকি এই ঘরে একজন যুবককে নিয়ে গোপনে রাত কাটাতো। তার এইসব কীর্তি-কাহিনী বিমলা এখানে আসার পর থেকেই বিভিন্ন লোকের মুখে শুনেছিলো।

দেখা হবার পর তার প্রথমেই মনে হয়েছিলো, : এই রোগাটে, গাল-ভাঙা মহিলা সম্বন্ধেই এই সব ভয়ানক আলোচনা চলছে? মিস পুষ্প সরকারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। বিমলা তার জায়গাতেই চাকরি নিয়ে এসেছে। তার মনে হয়েছিলো, কেমন করে পুষ্প সরকারের সঙ্গে সে কথা বলবে? কিন্তু পুষ্প সরকারই যেন কিছুই হয়নি, এমনভাবে বলেছিলো—

'আমার ঘরটাই আপনি নিন। এই বোর্ডিং হাউসের সেরা ঘর এটি।'

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে তাকিয়ে বলেছিলো—

'আমার কথায় বিশ্বাস রাখতে পারেন। ঠকতে হবে না এর জন্য।'

নয় বছর আগের এই ঘটনা। ওঃ গড, নয় বছর!

পুষ্প সরকার এখন কোথায়? ইস্পাতনগর থেকে আসা হোম সায়েন্সের শিক্ষিকা মাঝে মাঝে ওর কথা বলে। সে নাকি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করেছিলো, তারপরে কার সঙ্গে নাকি পালিয়ে গেছে। শেষ কথা তার সম্বন্ধে যা শোনা গেছে, তা হলো, সে নাকি ধর্মান্তরিত হয়েছে। মিস পুষ্প সরকার হয়েছে মধ্যবয়সী মিস ভাট, যাকে বিমলা দেখেনি। কিন্তু তার আগে?

পাহাড়ের ঢালু জায়গায় বরফ আর রোদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরের জানালার ফ্রেমে সেই পরিবর্তনের ছায়া লাগে।

বেশ কয়েক মাস পর বিকেলের নরম রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াবার একটা অকারণ ইচ্ছা তার মনের কোণায় দাপা-দাপি করতে লাগলো।

দরজাটা বন্ধ করে দিলো সে। আলনায় ছড়ানো ছেটানো শাড়িগুলো থেকে লাল পাতা ছাপ দেওয়া হলুদ শাড়িটা বেছে নিলো। লাল ব্লাউসের সোনালী বর্ডারটা বেশ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। হোক গে।

শাড়ি-ব্লাউস পরে সে আয়নার সামনে দাঁড়ালো। নিজের চেহারা সম্বন্ধে স্বাভাবিক কারণেই একটু বেশি ধারণা করে নিলো সে। তাকে তেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে না। আয়নাটা ঘরের একটু অন্ধকার দিকে দেওয়ালে খাটানো আছে। তাই তার মাথার দু একটা শাদা চুল অনায়াসে তার চোখ এড়িয়ে গেলো।

দিনের আলোতে আয়নার সামনে দাঁড়াতে তার লজ্জা হয়। বোর্ডিং হাউসের ঝি বলতো, মাদ্রাজীরা এখানে বাস করতে এলে তাড়াতাড়ি মাথার চুল পেকে যায়। এ কি তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য?

তার শুকনো মুখে একটু পাউডার মাখলো। ঠোঁটে লাগালো লিপস্টিকের ছোঁয়া। তার কালো ঠোঁট এখন রক্তের মতো লাল হয়ে

উঠলো। হ্যাঙার থেকে নীল কোটটা নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এলো এবং দরজা বন্ধ করে দিলো।

অমর সিং সিঁড়ির পাশে থামের কাছে বসে হুঁকা টানছিলো। তার গায়ে কিছু ছিলো না। না জুতা, না মোজা। গায়ে ছিলো খাঁকি ময়লা জামা। তার উপরে ছেঁড়া উলের সোয়েটার।

'অমর সিং, আমি বাইরে যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, বিবিজী।' নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে উত্তর দিলো অমর সিং।

'একটু ঘুরতে যাচ্ছি শুধু।'

'ভালো।'

সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে সে নেমে গেলো। 'গোল্ডেন নূকে'র পাশ দিয়েই রাস্তাটা বেঁকে নেমে গেছে নিচের দিকে। ঘোড়ার আরোহীদের জন্য তৈরী পাথর ছড়ানো রাস্তাটা অতিক্রম করে সে উঠে গেলো উপরের দিকে। সেখানে একটা সমতল মাঠ আছে। সেখানে পাহাড়ীরা বছরে একবার রামলীলা উৎসব পালন করে। এখান থেকে চারদিক বেশ সুন্দর দেখা যায়। এর পাশেই দুটি পাহাড়ের মাঝে একটা লেক আছে। যেন ঘটনাচক্রে এমন একটি সুন্দর লেক কেউ বসিয়ে দিয়েছে এখানে। এই প্রায় গোলাকার মাঠে দাঁড়িয়ে লেকের দু'পারের সারি সারি চাল দেখা যায়। রাস্তাটা চারদিক থেকেই লেকটাকে ঘিরে রেখেছে।

গাছের ফাঁক দিয়ে ওপারে লেকের নামের বিরাট সাইনবোর্ডটি দেখা যাচ্ছে।

লেক আর শহরের উপরে কুয়াশার মেঘ এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন অনেকদিন ভুলে থাকা একটি স্বপ্নের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি টুকরো।

॥ দুই ॥

তুমি ভাবছো, যেন দাঁড়িয়ে আছো পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরে। চারদিকে তোমার খাটানো হচ্ছে মশারী, যার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে তোমার নগ্নতায় ছিটকে পড়া আলোকে করছে প্রতিহত। যতদূর তোমার দৃষ্টি প্রসারিত, তুমি দেখতে পাচ্ছো বিকেলের সূর্যের সোনালী আলো দূরের বরফের চূড়া-পরা পাহাড়ের চারদিকে দ্রুত সঞ্চরমান। তার পেছনে তোমার সেই দেশের সীমানা যার কথা তুমি কখনও ভাবোনি। হিমেল বাতাসে ভেসে আসছে ভেজা মাটি আর সবুজ পাতার গন্ধ।

অন্ধকার শীতের শেষে একটি মুহূর্ত। কেবল একটি মুহূর্ত....জীবন থেকে নেওয়া একটি মুহূর্ত। 'এই মুহূর্তটি আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে সময়ের সুদীর্ঘ পথে।'

সুধীরকুমার মিশ্র

১৯৫৫ মে ১৯

হাঁস-ফাঁস করে টলতে টলতে এগিয়ে অবশেষে সেই মুহূর্তটির মাত্র এক হাত নাগালের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছো।

মুহূর্তটি সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে স্মরণাতীত কাল থেকে।

॥ তিন ॥

রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেছে এর মধ্যে। লেকের চারপাশে ছড়ানো ছেটানো গ্রীষ্মাবাসের মধ্যে একটিতে একজন যুবক নীল রঙ দিয়ে পিলার আর রেলিং রঙ করছে। সামনের ল্যাম্পপোস্টের গায়ে ঝোলানো সাইনবোর্ডে লেখা : 'সাবধান। কাঁচা রঙ।'

শহরটি মে মাসের মরসুমের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এর মধ্যেই যেসব ভ্রমণ বিলাসী ও টুরিস্টরা এসে পড়েছে, তাদের নতুন সাজে যেন শহরটি একটু মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধ বয়সের বলিরেখা যেন সযত্নে ঢেকে ফেলেছে।

লেকের চারদিকেই বেড়াবার নৌকাগুলি পাড়ে খুঁটিতে বাঁধা। যেন ঝিমোচ্ছে। স্বচ্ছ জলে হাঁসেরা দল বেঁধে ভেসে বেড়াচ্ছে। একটি নানা রঙে রঞ্জিত লাইফ-বয়া লেকের পাড়ে জলে নুয়ে পড়া গাছের ডালের সঙ্গে আটকে আছে।

রাস্তার পাশে বসার জন্য যে বেঞ্চি আছে, বিমলা তার একটিতে গিয়ে বসলো এবং শূন্য লেকের দিকে তাকিয়ে থাকলো। লেকের পাশের বাড়িগুলি যেন ঘুম থেকে উঠে সাজগোজ করছে। বিমলা এই শহরের হৃদয় পর্যন্ত চেনে। তারা পরস্পর পরস্পরকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

মে মাসে যখন শহরটি হাসি ও আনন্দে চারদিকে সুগন্ধ ও রঙিন শোভা ছড়াতে থাকে, তখন বিমলা যেন নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে।

কিসের জন্য তুমি অপেক্ষা করছো ?

অনেকের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব হলেও এখন দীর্ঘ নয় বছর পর একথা

আর কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে না।

একদল ছেলে-মেয়ে নিয়ে লেকে বেড়াবার জন্য একটি নৌকা তৈরি হচ্ছে।

খুব জোরে নৈনীদেবী মন্দিরের ঘণ্টা বেজে উঠলো।

যখন সে ছোট ছিলো, তখন সে প্রতি বৃহস্পতি এবং শুক্রবার গ্রামের মন্দিরে যেতো। ধান ক্ষেতের পিছনে ছিলো সেই মন্দিরটি। দু'পাশে হলুদ ফুল ফুটে থাকা মেঠো পথ ধরে সে যেতো। পথে তাঁতীদের একটা ছোট পাড়া পড়তো। সেখানে কুঁড়ে ঘরগুলির সামনে দড়ি টাঙানো থাকতো আর তাতে ঝুলতো নানা রঙ-বেরঙের সুতো। মন্দির থেকে ফেরার পথে সে প্রতিবারই যেতো সেখানে। বেড়ার পাশে পড়ে থাকা ঝিনুক কুড়িয়ে আনতো সে।

সে সময়ে তার বাবা বাড়ি থাকতেন না। বাইরে কোথায় যেন চাকরির চেষ্টা করতেন। বাবা বাড়ি ফিরুক, এটা বাড়ির কেউ পছন্দ করতেন না। মাঝে মাঝে এসে মার সঙ্গে ঝগড়া করে আবার চলে যেতেন বাবা।

কোথাও তাকে কেউ স্বাগত জানাতো না।

তিনি হয়তো আর কোনদিন সেখানে ফিরবেন না। আচ্ছা, সেই পুরোনো জীর্ণ মন্দিরটা কি এখনও আছে?

হয়তো সে-ও কোনদিন সুপুরি বাগানের পাশের সেই ছোট খড়-ছাওয়া ঘরটিতে ফিরবে না।

বাবা সেই পুরোনো গ্রামের কথা উঠলেই কেমন যেন খেঁচিয়ে ওঠেন।

'ওখানে আমার কে আছে?'

এই কুমায়ূন পাহাড়ে আপেল বাগানের মালিক এবং আলু গবেষক হিসেবে যতো লোক তাঁকে চেনে, ততো লোক কি গ্রামে তাকে চিনবে?

হয়তো একথা ঠিক।

মা গ্রামের কথা ভাবতেও পারেন না। সেখানকার আবহাওয়া তাঁর

কাছে অসহ্য। এই মনোভাব কি কেবল আবহাওয়ার জন্যই ?

বাবা যখন উলের কম্বলের নিচে শীতে কোঁকাতে থাকেন, মা তখন বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজ করেন।

সাধারণত মা তখনই সেই অজ পাড়াগাঁয়ে বাস করার অসুবিধার কথা বলে থাকেন এবং সেই সঙ্গে সেখানকার আবহাওয়া কত খারাপ, সে কথাও। হয়তো মায়ের মনে একটা প্রচ্ছন্ন ভয় ছিলো যে, বাবা তাঁর মনোভাব যে কোনও সময়ে পাল্টাতে পারেন।

আবহাওয়া !

নাকি এটা মার মনের দরজার উষ্ণতা ? তিনি মিসেস চক্রবর্তীর বাড়ি প্রতি সন্ধ্যায় যেতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে কি প্রতি বার মিস্টার আলফ্রেড গোমেজের আঙ্গিনা পেরিয়ে যেতে হতো ?

একবার অলকা হোটেলের উল্টোদিকে বোট ক্লাবের কাছে বসে সে তার গ্রামের বাড়িব কথা ভাবছিল।

'না, আমি কিছুই মনে করতে পারছি না।'

'কিছুই না ?'

'ষোল বছর আগের কথা, সুধীর। ষোল বছর।' মে মাসের এক রাত্রি। দূরের গাছপালাগুলোকে ধোঁয়াশার মত লাগছিলো।

'আমি পাঁচ বছর বয়সে যে সব ঘটনা ঘটেছে, তাও ইচ্ছে করলে মনে করতে পারি।'

এ যেন তাঁদের একটি একটি করে বাঁধন খোলার মতো। শব্দ আর রঙের বাহার আস্তে আস্তে সব বানচাল করে দিচ্ছিলো। ফেরী নৌকায় কাজুবাদাম তেলের গন্ধ, সেই সবুজ ধান ক্ষেত—এখানে সেখানে কাটা ঘাসের বোঝা, আর ভেত্তুভাই[২] কুটির থেকে ভেসে আসা লোকসঙ্গীতের সুর।

'এসো, আমাকে বলো।'

[২]কেরলের এক শ্রেণীর অনুন্নত সম্প্রদায়। নারকেলের খোসা সংগ্রহই সাধারণত তাদের পেশা।

কিন্তু তার হৃদয় বিড়বিড় করে উঠলো : 'না, প্লিজ, বলার জন্য আমাকে চাপ দিও না। আমাকে এখন অতীতে ঠেলে দিও না। কেন না, এর পরে বেঁচে থাকার জন্য তোমার সান্নিধ্য পাওয়া এই মুহূর্তগুলিই আমার একমাত্র সম্বল। এই মুহূর্তগুলি আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে দাও। যখন শব্দ পুরুষোচিত সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে যায়, তখন যেন তা আমার গালে আদরের হাত বুলায়।

'ষোল বছর? আমরা অবশ্যই একবার সেখানে যাবো। একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত থেকো।'

অনেক দূরে কেরালায়, তার গ্রামে দু'জন টুরিস্ট এসে উপস্থিত হলো উত্তর ভারত থেকে। শ্রী ও শ্রীমতী সুধীরকুমার মিশ্র।

'আমি তোমার গ্রাম দেখতে চাই বিমলা। আমি ভারতের অনেক জায়গা দেখেছি। ইউরোপ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, সিংহলেও আমি ছিলাম। আমি তোমার কেরালা দেখতে চাই। আমাদের গ্রামে কোনও কিছু সবুজ দেখতে পাবে না। প্রায় তিন মাইল দূর থেকে মেয়েরা খাবার জল নিয়ে আসে। আমি, যে কিনা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর একটা থিসিস লিখেছি, ভাবতে লজ্জা করে যে, নিজের দেশের সব দেখা হলো না। তুমি কি বলো, বিমলা?'

আমি কি বলবো? আমি কেবল তোমার সঙ্গে থাকার এই মুহূর্তগুলি চাই....

কিন্তু সে বিড়বিড় করে বললো :

'আমরা একবার সেখানে যেতে পারি।'

'যেতে পারি না, আমরা যাবোই।'

'হ্যাঁ, আমরা নিশ্চয়ই যাবো।'

শুধু একবার অচেনা একজন মানুষের মতো ছোটবেলায় যেখানে সে দৌড়ঝাঁপ করেছে, খেলেছে—সেখানে হেঁটে বেড়াবার জন্য।

শ্রীসুধীরকুমার মিশ্র।

শ্রীমতী বিমলা মিশ্র।

তুষার শৃঙ্গগুলি ক্রমশ তার দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হচ্ছে। আর এক ঝাঁক নীলিম কুয়াশা আস্তে আস্তে উপত্যকার দিকে নেমে যাচ্ছে। সেই রঙ-চঙে লাইফবয়াটি গাছের ডাল থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে।

সে উঠে দাঁড়ালো এবং লেকের কিনার ঘেঁষে মাল্লিতালের দিকে বেঁকে যাওয়া রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলো। লেকের কাছের প্রায় গোলাকার বালির মাঠটি এখন ফাঁকা। থিয়েটার হলের বাইরে চাতালে কয়েকজন লোক দল বেঁধে গল্প করছে।

যখন সে জেটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, তখন মাঝিদের ঝিমুনি ভেঙে গেলো।

'আসুন মেমসাব! একটু ঘুরে আসবেন।'

'মাত্র চার আনা, মেমসাব।'

সকলেই তাকে ডাকছে। তার প্রিয় নৌকা 'মে ফ্লাওয়ার' একটু দূরে বাঁধা।

'মে ফ্লাওয়ার!' কী সুন্দর নামটি!

বয়সের ছাপ মে ফ্লাওয়ারের গায়ে স্পষ্ট।

বুড়ো মাঝি প্রতাপের বদলে একটি অল্প বয়সের ছেলে বসে আছে তার লাল গদিতে। খুব শান্তভাবে বসে সে বিড়ি খাচ্ছে। সকলের থেকে অনেকটা দূরে। তার ছোট টানা টানা চোখে হাসির ঝিলমিল্। যখন বিমলা সেদিকে এগিয়ে গেলো, তখন ছেলেটির চোখের চাউনি ঈষৎ তীক্ষ্ণ হলো। তার ধূসর চোখে কিছু প্রাপ্তির আশা স্পষ্ট প্রতিভাত হলো।

বিমলা ভেবেছিলো, অন্য মাঝিরা তাকে কোনও না কোনওভাবে নৌকোয় তুলে ছাড়বে। কিন্তু সে-রকম কিছু হলো না। 'মে ফ্লাওয়ারে'র কাছে দাঁড়াতেই ছেলেটি হাত থেকে আধ-পোড়া বিড়িটা জলে ফেলে দিলো।

সে নৌকোটা পাড়ে ভিড়ালো তার জন্য। বিমলা উঠে বসলো।

ছ’জনের বসার গদিতে একা মাথা নিচু করে বসলো বিমলা।

ছেলেটি নৌকা ভাসালো। কিনার থেকে দেখতে দেখতে অনেক দূরে চলে গেলো নৌকাটি। বিমলা আনমনে ‘মে ফ্লাওয়ারে’র নতুন মাঝিকে দেখতে লাগলো। লাল চুল, কটা চোখ। গালে বিন্দু বিন্দু বাদামী দাগ।

‘প্রতাপ কোথায় ?’

‘মারা গেছে, মেমসাব।’

‘কবে ?’

‘চার বছর আগে। তখন মালিক মাসিক ভাড়ায় নৌকাটি দিয়েছেন আমাকে।’ সে বলে চললো—

‘টাকা চুরি করায় ভাটজী প্রতাপের ছোটভাইকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন।’

‘হুঁ....।’

একটু পরে জিজ্ঞেস করলো বিমলা—

‘তোর নাম কি ?’

‘লোকে আমাকে বুদ্ধু বলে ডাকে।,

সে বোকার মতো হাসলো।

বিমলার ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো। ভাবলো বোধ হয় দু’পাটি নোংরা হলুদ দাঁত বের করে বোকা বোকা হাসির জন্যই লোকে ওই নামে ডাকে।

‘কেউ কেউ মজা করার জন্য ‘গোরা সাহেব’ বলেও ডাকে।’

‘গোরা সাহেব !’

‘হ্যাঁ, মেমসাব। আমার বাবা একজন সাহেব ছিলেন।’

‘সত্যি ?’

‘সত্যি, মেমসাব। আমি কখনও তাঁকে দেখিনি। মা বলেছেন।’

‘মা কি করেন ?’

‘তিনি মারা গেছেন।’ বলে দূরের একটা বাড়ির দিকে আঙুল

দেখিয়ে বললো—

'সে বছর ওই বাড়িটা তৈরি হয়েছে। ছয় বছরের বেশি হবে।'

বৈঠা যেন নিয়মিত ছন্দে জল স্পর্শ করছে। তার থেকে যে বুদ্‌বুদ্‌ উঠছে, তা দেখে জলের গভীরতা বোঝা যাচ্ছে।

'মেমসাব! আপনি ওই মেয়েদের স্কুলটায় পড়ান, না?'

কেমন করে এই ছেলেটি তাকে চিনলো। আশ্চর্য হয়ে সে ঘাড় বেঁকিয়ে সমর্থন জানালো।

'আমি আপনাকে দেখেছি।'

'হুঁ।'

সে আবার নৌকোটা আস্তে আস্তে চালাতে শুরু করলো।

'তোর বাবা কোথায়?

'জানি না। কিন্তু একদিন তাঁকে খুঁজে বার করবোই।'

'কি নাম তাঁর?'

'তাও জানি না। মা কেবল এক সপ্তাহ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু আমি সব সময় তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

বিমলার মনে একটা ছবি ফুটে উঠলো।

সতের বা আঠার বছর আগের।

আচ্ছা, এই ছেলেটির বয়স কত হবে? আঠার বছরের বেশি নয়।

সতের কি আঠার বছর আগে এক মে মাসে একজন সাহেব এসেছিলেন এই পার্বত্য শহরে। তার কাছে হয়তো একজন দালাল একজন তরুণীকে নিয়ে এসেছিলো।

তারা কেউ কারও কথা বুঝতে পারেনি। কিন্তু শিকারী শিকার করেছিলো ঠিকই।

ওই সাহেবের এই শহরে থাকবার একটি চিহ্ন এখনও বর্তমান। নৌকার মাথায় দাঁড় নিয়ে বসে আছে। কটা চোখ আর লালচে চুল-মাথা ছেলেটি।

লেকের পুব দিকে কয়েকটা বিদ্যুৎ-বাতি দপ্‌দপ্‌ করছে। নিচে

পশ্চিমের জীর্ণ মন্দিরের দিকে ডানা ঝট্‌পট্‌ করে সমুদ্র ফেনার মতো উড়ে যাচ্ছে এক ঝাঁক হাঁস নীলাভ আস্তরণের ভেতর দিয়ে।

এবার বোধহয় মরসুম একটু দেরিতেই আরম্ভ হবে। তাই না মেমসাব?'

'বোধহয়।'

'গত মরশুমে সাহেবরা বেশি আসেননি। এ মরসুমে কি হবে, কে জানে! আমার মনে হচ্ছে, এবার আমি খুঁজে পাব আমার আমার....।'

যখন ছেলেটি কথা শেষ করতে ইতস্তত করছিলো, তখন বিমলা বলে উঠলো—

'বাবাকে।'

একরাশ উজ্জ্বলতা ছেলেটির চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো।

'হ্যাঁ। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে দীনুকাকা থাকেন। তিনি হাত দেখে ঠিক এ-কথাই বলেছেন।'

একদিকে ঝুঁকে নৌকা চালাচ্ছিল বুদ্ধু। তার চোখে একটা প্রত্যাশার আলো যেন ঝক্‌ মক্‌ করছে—স্পষ্ট দেখতে পেলো বিমলা।

'যদি তাঁকে খুঁজে পাও, তবে কি জিজ্ঞেস করবে তাঁকে?'

'কি জিজ্ঞেস করতে পারি? আমি কিছুই জিজ্ঞেস করবো না। শুধু তাঁকে দেখতে চাই। বাস্‌।'

উত্তর শুনে হাসতে পারলো না বিমলা। সে অনুভব করলো, স্তূপীকৃত এক খণ্ড তুষার তার ভেতরে কোথাও দ্রবীভূত হচ্ছে। আমি কিছুই চাই না। শুধু তাকে দেখতে চাই।....

এই ছেলেটা, যে কেবল বোকার মতো হাসে আর কথা বলে, সে কি বুঝতে পারছে, বিমলার মনকেও এই এক-ই কথা অবিরাম ক্ষত বিক্ষত করছে? 'আমিও তাকে দেখতে চাই বুদ্ধু। আর কিছু না ....।'

হঠাৎ চোখে পড়লো বিমলার লেকের পারের বাড়িগুলোর মাথায় দিনের শেষ রোদ্দুর লেপটে পড়ে চিক্‌চিক্‌ করছে। মাঠের মধ্যে অবস্থিত গম্বুজের মাথায় জ্বলন্ত বিদ্যুৎ-বাতি থেকে ঠিকরে পড়ছে আলো চারদিকে।

পাইন বনে ছড়িয়ে পড়েছে আবছা অন্ধকার।

তারা জেটির খুব কাছে এসে পড়েছে।

'এখন কি নৌকা জেটিতে ভিড়াবো, মেমসাব? নাকি আর এক বার ঘুরিয়ে আনবো?'

'না।'

কাঠের জেটির সঙ্গে নৌকা ভিড়ানো হলো।

বিমলা নৌকা থেকে নামলো। হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে একটা আধুলি বের করে দিলো ছেলেটির হাতে। যখন সে দেখলো, আধুলিটি হাতে নিয়ে ছেলেটি পকেট হাতড়াচ্ছে, তখন ভাবলো, নিশ্চয়ই খুচরো পয়সা খুঁজছে।

'কিছু ফেরত দিতে হবে না। ও দিয়ে চা খেয়ে নিস।'

নোংরা হলুদ দাঁত বের করে ছেলেটি হাসলো। তারপর জামার ভেতরের পকেট থেকে ছোট চামড়ার ব্যাগ বার করলো এবং তার থেকে খুব সযত্নে এক টুকরো কাগজ।

'এটা দেখুন মেমসাব।'

ওটা কাগজের টুকরো নয়, খুব পুরোনো একটা ছবি? ওর মুখের বিন্দু বিন্দু দাগের মতো সময় ছবিটার উপরও দাগ ফেলেছে। ছবিটা ময়লাও হয়ে গিয়েছে বেশ। জেটির সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তার স্বল্প আলোয় ছবিটা দেখলো বিমলা। দেখলো, চোগা ও পুলোভার পরিহিত অশ্বারোহী এক তরুণ সাহেবের ছবি।

যখন বিমলা ছবিটি ফিরিয়ে দিলো ওর হাতে, তখন ছেলেটি শান্ত কণ্ঠে বললো: 'আমি আপনাকে বলিনি। তাঁকে খোঁজার একটা পথ আমি পেয়েছি। এই ছবিটাই সেই পথ। কিন্তু এতদিন এটা আমি কাউকে দেখাই নি।'

বাসস্ট্যাণ্ড পুরো ফাঁকা। কালো ছেঁড়া কোট ও পিঠে গোলাকার দড়ি বাঁধা ভুটিয়া কুলিরা এখানে সেখানে জটলা করে বসে আছে। মনে হচ্ছে যেন যমের সহকারী।

পোস্ট অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন সৈনিকের তার

দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকানো, চোখ না ফিরিয়েই উপলব্ধি করলো বিমলা। সে দ্রুত হাঁটতে আরম্ভ করলো।

॥ চার ॥

পশমের বিছানার মোটা লেপের নিচে নিজেকে ঢুবিয়ে দিয়ে সে স্বস্তি বোধ করলো। আরও একটা দিন গেল।

অস্বাভাবিক ক্লান্তি অনুভব করলো সে। সে তার চোখ বন্ধ করলো। ভাবলো, তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু ঘুম এলো না। তার কেবলই মনে হতে লাগলো, যেন অতল গহ্বরে সে তলিয়ে যাচ্ছে। কেবল তার দেহ নয়—তার বিছানা, ঘর, সমস্ত বাড়ি, পাহাড় চূড়া থেকে তুলোর ফেঁসোর মতো নিচে গড়িয়ে পড়ছে ধীরে, অলসভাবে ঘুরপাক খেতে খেতে গভীরে....।

আতঙ্কে কেঁপে উঠলো সে, চোখ মেলে তাকালো। যে মুহূর্তে সে চোখ বন্ধ করে .... সেই অতল গহ্বরে পতন শুরু হয় .... গভীরে....আরো গভীরে।

মন যেন একটা বুনো বাঁদরের মতো। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কেবল লাফিয়ে বেড়ায়। তা না হলে এখন রেশমীর কথা মনে পড়বে কেন তার?

হালদানির টুরিস্ট বাংলোর একটি ঘরের কথা তার মনে পড়লো।

সেই অন্ধকার মুহূর্তগুলিকে পেছনে রেখে সে হালদানির রেস্ট হাউসের তিনটি ঘরের মধ্যে একটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো।

ভাববার মতো আর কতো জিনিসই তো রয়েছে!

জানালা বন্ধ। তবু হাসি, ঢাক আর বাঁশির অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে।

হয়তো বা পাহাড়ীদের কোনও বিয়ের শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। হ্যাজাকের আলো, ঘোড়ার পিঠে চলেছে বর—মাথায় সিল্কের পাগড়ি আর কোমরে কোষাবদ্ধ তলোয়ার—সেই একই পরিচিত দৃশ্য।

আর পাশের কোনও পাহাড়ী গ্রামে পাইন গাছে আড়াল করা ছোট কুঁড়ে ঘরে বিয়ের সাজে সজ্জিতা ভাবী বধূ দুরুদুরু বুকে শুনছে সেই এগিয়ে আসা ঢাক আর বাঁশির শব্দ। যেন প্রতীক্ষা করছে এক স্বাগত মুহূর্তের জন্য। তার মনে তখন তুষার-ঝড়ের সে কী প্রচণ্ড দাপাদাপি।

সমস্ত পৃথিবীই যেন প্রতীক্ষা করছে।

বাসস্ট্যাণ্ডের পাশে অথবা চাতালের সামনের কোনও এক জায়গায় বেঘোরে ঘুমন্ত বুদ্ধু, সেই ছবিটা পুরোনো চামড়ার ব্যাগে আঁকড়ে ধরে প্রতীক্ষা করছে কারও জন্য। একদিন ওর সাহেব নিশ্চয়ই আসবে।

একদিন সে আবার আসবে....তুই আর আমি, আমরা সকলেই এতকাল ধরে প্রতীক্ষা করছি।

সময়ের প্রস্তরখণ্ডে তুষার পড়ে, তুষার গলে যায় এবং আবার কুয়াশার আবরণ সৃষ্টি হয় তার চারপাশে।

আমরা সবাই প্রতীক্ষা করছি।

বুদ্ধুর জন্য সে দুঃখ অনুভব না করে পারলো না। বুদ্ধুর বন্ধুরা হয়তো তার নোংরা চেহারা আর গল্প শুনে তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

কিন্তু বুদ্ধুর দুঃখ সে উপলব্ধি করলো। কারণ সে-ও তো প্রতীক্ষা করে আছে কারও জন্য। প্রতি বছর এপ্রিলে একটি স্বপ্ন, যা নয় বছর আগে সে হারিয়েছে, তার সফল রূপায়নের জন্য সে প্রতীক্ষা করে আছে।

প্রতি বছর যখন এই পার্বত্য শহরটি দূর থেকে আগত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে, তখন তার হৃদয়ের অন্ধকার কোণেও শুরু হয় আশ্চর্য মর্মরধ্বনি।

আমি কারও জন্য প্রতীক্ষা করছি না। সে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। কে আমার সঙ্গে প্রতারণা করছে?

কিন্তু যখন পত্র-পল্লবে বিকশিত হয় আপেল বাগান, যখন কঠিন বরফ গলতে শুরু করে, দূরের পাহাড় চূড়ায় শুরু হয় সূর্যের ঝিলিমিলি, সে তখন ভাবে: আরও একটি মরসুম প্রতীক্ষা করা যাক কুমায়ুনের পাহাড়ে।

এখন সে প্রকৃতির ঋতুতে মুখশ্রীর পরিবর্তনকে অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করেছিলো। একদিন রাত্রে অনেকদূর থেকে চিৎকার শুনতে পেয়েছিলো সে।

উৎসব আনন্দমত্ত জনতার কোলাহল।

'হোলি গঙ্গা সাগর মে

পার গঙ্গা সাগর মে

হোলি হ্যা....'

আবার এক হোলি এলো।

'বিবিজী! পরশুদিন হোলি।' অমর সিং তার বখশিসের কথা মনে করিয়ে দিলো।

এখন প্রতিটি রাত মনে হয় যেন অচেনা কোনও পথিকের পদ-শব্দ কান পেতে শোনে।

পাহাড় বক্ষে আবদ্ধ জলের মতো সময় যেন এখানে বন্দী। যারা বছরে একবার করে এখানে আসে, তারা বলে, এর কিছুই পাল্টায়নি।

কিন্তু এই নয় বছরে এখানকার কত পরিবর্তন ঘটে গেছে। তোমার মতো যারা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে আসে, তারা এই পরিবর্তন দেখতে পায় না। কারণ, দামী কালো পশমের আচ্ছাদন ঢেকে রাখে বয়সের ভার, নতুন ভাবে রঙ করা ল্যাম্পপোস্টের আলোয় ঢাকা পড়ে ভাঙা-চোরা সব।

এমন কি পাহাড় চূড়ার যে পাথরটার উপর তুমি আর আমি বিশ্রাম নিতে নিতে নিজেদের বিশ্বজয়ী সম্রাটের মত ভেবেছিলাম—সেই জায়গা-

টার নাম পর্যন্ত পাল্টে গেছে।

সে ক্রমশ অন্ধকারের গভীর থেকে গভীরতর গহ্বরে তলিয়ে যেতে থাকলো। হায় ঈশ্বর! সেখানেও স্মৃতির শাদা মেঘ....।

পাথর ছড়ানো পথে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। যার রক্ষকের গুণাগুণ এখনও অজ্ঞাত। পরণে ময়লা উলের কোট, পকেট ঝুলে পড়েছে অনেকটা। মাথায় পশমের টুপি এবং গলায় মাফ্‌লার জড়ানো। দু'টি ঘোড়া। একটা শাদা এবং অন্যটি ধূসর বাদামী।

'শাদাটা আমার ভালো লাগছে।'

'যা তোমার পছন্দ।'

'গাইড! এই ঘোড়াটার নাম কি?'

'এটা ঘোড়া নয়, ঘুড়ি। তুমি না প্রাণিবিদ্যার শিক্ষিকা!' লজ্জায় মাথা নত করেছিলো সে।

গাইড উত্তরে বলেছিলো: 'মোতি।'

ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ: 'এখানকার প্রায় সব ঘোড়ার একই নাম—মোতি।'

পাহাড় চূড়ার একটা গাছে ঘোড়াটা বেঁধে রেখে তারা হেঁটে গিয়েছিলো কাছের মন্দিরটায়। মন্দির চত্বরে টুরিস্ট গিজ্‌গিজ্‌ করছিলো। প্রায় প্রত্যেকের ঘাড়ে একটা করে ক্যামেরা ঝোলানো। মন্দিরের ঘণ্টা বাজছিলো। প্রার্থনা করছিলো অনেকে।

'আমরা কি এ-পথ ধরেই যাবো।'

ভারী উজ্জ্বল ছিলো সকালটি। কুয়াশার পাতলা ঘোমটায় বাতাসের সে কী মাতামাতি!

'তুমি কি এর আগে কখনও এ-পথে এসেছো?

'না।'

'তুমি কি জান, এই জায়গাটাকে কি নামে ডাকা হয়?'

নিচের দিকে তাকিয়ে সে মৃদু হেসেছিলো। কি নামে ডাকা হয়, তা সে জানতো। কিন্তু সে কিছু বলেনি।

'খুব সুন্দর নাম, প্রেমিক সরনি।' পাথরটাকে কেমন যেন গোলাকার

মনে হচ্ছিলো—যেন আকাশের উন্মুক্ত বুকের মতো।

'আচ্ছা, পাথরটারও একটা নাম দেয় না কেন লোকেরা?'

যেখানে প্রেমিক সরণির চলার সমাপ্তি—

'কি নাম দেওয়া যায় পাথরটার?'

পাথরটার উপর কিছু নাম ও চিহ্ন খোদাই করা ছিলো!

'গতকাল হোটেলে দু'জন বন্ধুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো। তারা আমাকে এই জায়গাটার কথা বলেছে।'

পাথরটার উপর দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালে সত্যি বুকটা কেঁপে ওঠে। নিচের আপেল বাগানগুলিকে ছোট ছোট চতুর্ভূজের মতো দেখা যায়। এখানে যে-সব প্রেমিক-প্রেমিকা নিভৃত সংলাপের জন্য আসে, তারা সহজেই নিজেদেরকে আড়াল করবার মতো জায়গা খুঁজে পায়।

'সময় পুরোনো নাম মুছে দিয়েছে এবং বহু নতুন নাম খোদিত হয়েছে তার উপর।'

কোমল বাতাস আর উষ্ণ সূর্য। সে যে সমস্ত শহর ভ্রমণ করেছে তার কথা বলছিলো এবং আরও অনেক প্রসঙ্গে ....জিম করবেট প্রসঙ্গ.... বড় রাজপথ....কিসিং গেমস।

মাত্র পাঁচদিন আগে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো বিমলার। লেকের পারে সে দেখা হতেই মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করেছিলো, 'ক'টা বাজে?' সেদিন-ই সকালের বাসে পাশাপাশি সিটে তারা বসে এসেছিলো। কিন্তু তারপরের পাঁচটা দিন মনে হয়েছিলো যেন পাঁচটা বছর···। বাইরে শহরের চোখ দু'টি দপ্ দপ্ করছিলো। আর একটি দরজা-জানালা বন্ধ ঘরে বিমলা তার হাতে মাথা ও বুকে বুক রেখে লেপের নিচে শরীর এলিয়ে দিয়েছিলো। বিমলা যেন চিৎকার করে বলতে চেয়েছিলো:

'আমি একা নই—আর একা নই।'

নতুন টুরিস্টরা কেউ পাথরের মাথায় উঠতে চায় না। একবার জুনে একটি মেয়ে সেখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলো। তখন যে জায়গাটায় প্রেমিক-প্রেমিকারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে

ঘুরে বেড়াতো, তা একেবারে ফাঁকা। পাথরটার কাছে যাবার বাঁকে কে যেন লিখে রেখেছে: 'সহজ মৃত্যুর পথ।' তার নিচে মাথার খুলির ছাপ।

পরে পথটার নতুন নাম হয়েছে: 'দি ডেভিলস্ ট্রাক্।'

পাথরটির মাথা, যা আকাশের বক্ষঃস্থল পর্যন্ত বিদীর্ণ করেছে—সেখান থেকে নিচ পর্যন্ত অনন্ত অতল গহ্বর—।

পাঁচ

অমর সিং দু'টো চিঠি এনে দিলো তাকে।

চিঠি দেখলেই তার মন আলোড়িত হয়ে ওঠে। যতই সে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করে, ততই তার বুকের টিপ্ টিপ্ বেড়ে যায়। নয় বছর পরেও এর কোনও পরিবর্তন হয়নি।—ভাবে, একবার খামটা খুললেই, সেই রক্তিম বর্ণগুলি তার চোখের সামনে ঝল্‌মল্ করে উঠবে: 'আমার প্রিয় বিমলা!'

যখনই অমর সিং পোস্ট-অফিস থেকে ফিরে আসে, তখনই প্রত্যাশার পরীর দেশ আর স্বপ্ন তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অচিরেই তা আবার হারিয়ে যায়, বুদ্‌বুদের মতো।

একটা পোস্টকার্ড এসেছে তার ভাই বাবুর কাছ থেকে। বাবু বা অনিতা, কেউ-ই তাদের মাতৃভাষা পড়তে বা লিখতে পারে না।

শেষের দু'টো পংক্তিতে লেখা আছে: 'আমার চিঠি পাওয়া মাত্র পঁচিশ টাকা পাঠাবে।'

মাত্র তিপ্পান্ন মাইল দূরে তার বাড়ি। বাড়ির চারিদিকে আলুর

কেত। সেখানে তার পরিবারের সবাই আছে : বাবা, মা, বাবু, অনিতা।

বাড়িতে বিমলা আর অনিতা খাবার-ঘরের মুখোমুখি ঘরটায় শুতো। বাবু শুতো অকেজো জিনিস-পত্র রাখার ঘরটায় চারপাইয়ের ওপর।

কিন্তু সাধারণত সে রাতে ঘুমোতো না।

অন্ধকার গাঢ় হলে বাবু আস্তে আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে যেতো। ডাকবাংলোর পাশে একটা একতলা দোকান ঘর ছিলো। সেখানে গাঁজার ধোঁয়ায় ভরা একটা ঘরে সে সারা রাত বসে তাস খেলতো।

মা সব জানতেন। যখনই তিনি খাবার ঘরে জল নেবার জন্য এসে আলো জ্বালাতেন, তখনই এক রাশ আলো লুটিয়ে পড়তো বাবুর খালি বিছানায়। মা দেখেও না দেখার ভান করতেন।

'বাবু কি ঘুমোতে গেছে।'

'হ্যাঁ।'

'এত তাড়াতাড়ি?'

'হুঁ'।

শুধু এটুকুই মা বলতেন। কারণ, সত্যিই তিনি নিজের ছেলে সম্বন্ধে শঙ্কিত ছিলেন। কেবল তিনি তা প্রকাশ করতেন না। বাবুর চোখেও ফুটে থাকতো রাগের ছাপ। সর্বদা। একদিন—

এক ছুটিতে মা ছিলেন বাড়িতে। বাবা যখন বাথরুমে গেছেন, তখন বাবু মা-কে এসে বললো—

'আমার পঞ্চাশটি টাকা দরকার।'

'আমার কাছে কিছু নেই।'

'যেখান থেকে পার, জোগাড় করে দিতে হবে। খুব জরুরী।'

'বাবাকে বল। তিনিই তো রোজগার করেন।'

'যদি তুমি না দাও—।'

এক মুহূর্তের জন্য সে থামলো। মা কেবল ফুঁপিয়ে উঠলেন।

'তাহলে একটা চিঠি লিখে দাও। আমি মিস্টার গোমেজের কাছ থেকে নিয়ে যাবো টাকাটা।'

'বাবু!'

যখন মা আর ছেলে নিশ্চুপ পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তখন বিমলার বুকের টিপ্ টিপ্‌কে ঢাকের জোর শব্দ বলে মনে হতে লাগলো।

অলসভাবে বিমলা ঘরের একটি পরিত্যক্ত বেঞ্চির উপর বসেছিলো। মা চলে গিয়েছিলেন ভেতরে। তাঁর বাক্স খোলা ও বন্ধ করার শব্দ। কিছুক্ষণ পর তার ভাই বিজয়ীর মতো বেরিয়ে গিয়েছিলো।

এখন দেওয়ালের পাশের বড় খাটটায় বাবা ঘুমোতে থাকবেন।

এমন কি, যখন তিনি ঘুমোন না, তখনও চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন। যখন কারও পায়ের শব্দ শুনতে পান কাছে, তখন চোখের পাতা পিট্ পিট্ করতে থাকে। কিন্তু চোখ মেলে তাকাতেও তাঁর কষ্ট হয়।

তাঁকে কথা বলতে দেখলে মা'র কেমন যেন বেদনা হতো। অবশ্য সেগুলিকে কথা না বলে দুর্বোধ্য শব্দের সমাহার বলা যায়।

সপ্তাহ খানেক আগে মা লিখেছেন: 'এখন তিনি আর কথা বলতে পারেন না। কেবল চোখ পিট্ পিট্ করা ছাড়া কোন দৈহিক কাজই করতে অক্ষম।'

দু'বছর যাবৎ তিনি এ-ভাবে বিছানায় পড়ে আছেন। যখনই বিমলা তাঁকে দেখতে গেছে, তখনই মনে হয়েছে মৃত্যু এখন তাঁর আশীর্বাদ। বাবার মধ্যে যে মানুষটার এতো প্রশংসা করে এসেছে বিমলা, তার আগেই মৃত্যু হয়ে গেছে। যখনই সে তার বাবার কথা ভাবে, তখনই বদামী রঙের স্যুট্ ও মাথায় পশমের টুপি পরিহিত একজন লম্বা মানুষের ছবি তার সামনে ভেসে ওঠে, হাতে ছরি ঘোরাতে ঘোরাতে যে কিনা সোজা হেঁটে চলেছেন। বাবা কেবল গৃহকর্তাই ছিলেন না, ছিলেন তাঁর ক্ষুদ্র সাম্রাজের খেয়ালী প্রজাপীড়ক শাসক। খাবার টেবিলের সামনে একটি বিরাট ক্ষোদাই করা চেয়ার থাকত তাঁর। কেউ তা স্পর্শ পর্যন্ত করতে সাহস পেতো না। পাশ দিয়ে হেঁটে যেতেও ভয় হতো সকলের।

তাঁর বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যেতো বাড়িটা।

কেবল তাঁর পাইপ্ থেকে তামাকের গন্ধ ছড়িয়ে পড়তো চারদিকে। প্রয়োজনীয় কথাবার্তাও ফিস্‌ফিস্ করে বলতে হতো।

মা বিকেলে একটুও বিশ্রাম নিতে পারতেন না। বিকেল আরম্ভ হতো তিনটে থেকে। তখনই তিনি উঠে চা আর জল-খাবার তৈরী করতে আরম্ভ করতেন। সাড়ে চারটেয় বাবা বাড়ি ফেরার আগে সব তৈরি করে রাখতে হতো।

বাড়িতে পা দিয়েই তিনি সোজা চেয়ারটায় গিয়ে বসতেন। জামা-কাপড় পাল্টাবার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করতেন না। যদি তার মধ্যে টেবিলে সব সাজানো না থাকতো, তাহলে শুরু হতো লঙ্কাকাণ্ড।

তাঁর সঙ্গে খেতে বসাও ছিলো রীতিমতো অগ্নিপরীক্ষা। 'বিমলা কোথায়? বাবু কোথায়?'

'তারা এখনও রেডি হয়নি। পরে খাবে।'

'না। বিমলা, বাবুকে এখনই খেতে হবে।'

যদি ঢালতে গিয়ে চা পড়ে যেতো টেবিলে, কিংবা কেউ ঢেকুর তুলতো বা হাঁচি দিতো, তাঁর মুখ রাগে লাল হয়ে যেতো। তিনি বকতেন না। তবে তাঁর কট্‌মট্ করে তাকানোই ছিলো যথেষ্ট।

একবার অনিতা বলেছিলো:

'বাবা! আমরা কেরালায় আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে যাবো।'

'সেখানে কি তোদের কোনও দাদু বসে আছে তোদের অভ্যর্থনা করার জন্য?'

অনিতার দু'চোখ জলে ভরে গিয়েছিলো।

বাবা কখনই আন্তরিকভাবে গ্রামের কথা বলতেন না।

বাবাকে তারা সব সময় ভয় করতো। এমনকি চিঠি লেখার সময়েও। চিঠি লিখতে হতো সব সময় ইংরেজিতে। ইংরেজি ভুল থাকলে তার নিচে লাল কালির দাগ দিয়ে সাবধান করে ফেরৎ পাঠাতেন: 'মনে রেখো, আমার কষ্টার্জিত টাকা ব্যয় হচ্ছে তোমার লেখাপড়া শেখার জন্য।'

এসব বিগত দিনের কথা। এখন তাঁকে ভয় করার প্রয়োজন হয় না কারও। কেবল সেই ক্লান্ত চোখ দু'টি যেন বিগত অগ্নিকুণ্ডের ভস্মাবশেষ।

চার মাস আগে বিমলা বাড়ি গিয়েছিলো। প্রথম দিনটাই ভীষণ বিরক্তিকর লেগেছিলো তার। দ্বিতীয় দিনেই সে ফিরে এসেছিলো।

সন্ধ্যায় সে বাবার বিছানার পাশে একাকী বসেছিলো। বাবা কি যেন বলবার চেষ্টা করছিলেন প্রাণপণে।

'আপনি কিছু বলতে চেষ্টা করবেন না বাবা। নিজেকে অকারণে ক্লান্ত করবেন না।' সেই সময়েই বাবার দু'টো চোখে তার চোখ পড়তে সে জীবনে প্রথম মানুষের সত্যিকারের অসহায় ভাব প্রত্যক্ষ করেছিলো। গরীব ঘরের একজন অবহেলিত যুবক বিয়ে করেছিলো ধনী ব্যক্তির মেয়েকে। এটা নিঃসন্দেহে রোমাঞ্চকর কাহিনী। সে শৈশবে বহুবার এর গল্প শুনেছে। বাবা প্রথমে ছিলেন ছোট এক জমিদারের কেরানী। তারপর পোস্টমাস্টার। অবশেষে সেই চাকরি ছেড়ে এসেছিলেন মাদ্রাজে পড়াশোনা করবার জন্য। বিয়ের পর বোনের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধে। সম্পত্তি ভাগ করে তার অংশ তাকে দিয়ে সব ছেড়ে চলে আসেন জীবনের মতো।

সময়ের প্রতিকূল ঝড়ে অভিজ্ঞ মানুষটি এখন অসহায়ভাবে পড়ে আছে বিছানায়।

সে বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়াতে পারেনি। দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলো সীমানার বেড়ার পাশে।

ভাটনগরের বাড়ি যাচ্ছি বলে মা যথারীতি বেরিয়ে গিয়েছিলেন। চকচকে শাড়ি, রাঙানো লাল ঠোঁট, কলপ করা চুলে লালচে ভাব। মেক আপ করলে মাকে বীভৎস দেখায়।

তার বোন অনিতা দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলো। সে-ও সাজগোজ করতে আরম্ভ করেছে। হয়তো তার দরকার আছে। ডাক্তারের ছেলে প্রদীপচন্দ্র শর্মা হয়তো কোথাও ওত পেতে আছে ওর জন্যে।

যদি এ-সব তার বাবাকে যেদিন ক্লাব থেকে অসুস্থ অবস্থায় ধরে আনা হয়েছিলো, সেই দুর্ভাগ্যময় দিনটির আগে হতো—কারও সাহস হতো না বাড়ির বাইরে পা রাখতে।

এখন বাবু সকলের সামনেই গাঁজা খেতে আরম্ভ করেছে এবং পাহাড়ীদের সঙ্গে জুয়া খেলতে শুরু করেছে। অনিতা বাড়ির চাকর বীর বাহাদুরের মাধ্যমে প্রেম-পত্র দেওয়া-নেওয়া করছে। বাড়ির কাজ-কর্ম দেখার মতো সময় মায়ের নেই। তিনি তার মুখে বয়সের দাগ মুছে এবং মাথার চুলে বয়সের ছাপ আটকে যৌবনকে ধরে রাখতে অক্লান্ত চেষ্টা করে চলেছেন।

রোগশয্যায় শুয়ে বাবা কি এসব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল? হয়তো জানেন। ওই দু'টো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অবশ জিহ্বার স্থান অধিকার করেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় বাবার বন্ধু ডাঃ মেনন ও তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন বাবার স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে। বিমলা ছাড়া আর কেউ তখন বাড়ি ছিলো না। শ্রীমতী মেনন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—

'বিমলা, তোমার মা কোথায়?

'বাইরে গেছেন।'

বিমলা তার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছিলো। তিনিও হয়তো তার মায়ের মিস্টার গোমেজের সঙ্গে গোপন সম্পর্কের কথা জানেন।

সেই রাতে তার পরিবারের সকলের সঙ্গে একই ঘরে তার নিজের খাটে শুয়েছিলো। কিন্তু ঘুমোতে পারেনি। একে কি একটা পরিবার বলা চলে?

আমি সব কিছুকে ঘৃণা করি....সব কিছুকে।

মার্চ মাসে বাবু একবার এসেছিলো তার বোর্ডিং হাউসে। তখন হোলির সময়। মা সে কথাটা তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য বাবুকে পাঠিয়েছিলেন।

অনিতা লিখেছিলা: 'প্লিজ, এসো।'

দু-তিন দিন পরে যাবে বলে সে বাবুকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিলো।

সে তার বোনকে লিখেছিলো : 'আমি খুব ব্যস্ত। তাই যেতে পারবো না।'

একদিন তার ভাই কিংবা বীর বাহাদুর দরজায় ঠক্‌ঠক্ শব্দ করবে।

'কি খবর?'

'বাবা মারা গেছেন।' বা 'সাহেব আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, বিবিজী।'

একদিন—

বাবার সেই শুভদিন আসুক। বিছানায় পড়ে পড়ে তার হৃত ক্রমশঃ ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়া পাথরের ক্রন্দনধ্বনি শোনা স্তব্ধ হোক।

দ্বিতীয় চিঠিটি এসেছে তার সহকর্মী শান্তার কাছ থেকে। সে তার কাজ ছেড়ে দিচ্ছে এবং বিয়ে করছে।

সে অভিনন্দন জানিয়ে একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে পারতো। কোড নম্বর আট, চোদ্দ, সতের। এ কাজের সুবিধার জন্য ডাক ও তার বিভাগ আন্তরিকতাহীন কতগুলি শব্দ তৈরি করে রেখেছে।

একের পর এক, বোর্ডিং হাউসের বাসিন্দারা জীবনে পলায়ন করেছে।

সারাদিন ধরে কী ঠাণ্ডা বাতাস! সে সারাদিন ঘরে বসে কাটাবে বলে স্থির করলো। ঘরটা ঠিকঠাক করলো সে। বাক্সে সব জামা-কাপড় রাখবার জন্য খুলে সে একটা গোলাপী রঙের সোয়েটার দেখতে পেলো, যার উপর গানের স্বরলিপির মতো কালো রঙে কিছু আঁকা। সে একদিনও এটি পরেনি।

তারা এটা কিনে এনেছিলো মাল্লিতালের এক বুড়োর দোকান থেকে ঠিক তার চলে যাবার আগের দিন। বিমলা নিজেই এটি পছন্দ করেছিলো।

'তুমি কি একটা সোয়েটার বেছে দেবে আমাকে?'

'কার জন্য?'

'একটি মেয়ের জন্য।'

সে বিমলার মুখের দিকে দুষ্টুমী ভরা চোখে তাকিয়েছিলো।

দেখছিলো তার মুখে কোনও ঈর্ষার ভাব জেগেছে কিনা।

বুড়ো দোকানদার নিজেই একটার পর একটা খুলে দেখাচ্ছিলো তাদের।

সে এই প্রথম স্বরলিপি আঁকা একটা সোয়েটার দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলো। রঙটাও ছিলো খুব সুন্দর।

'এটা খুব সুন্দর।'

'তোমার পছন্দ ?

'আমার তো পছন্দ হয়েছে। জানিনা, যে মেয়েটির জন্য কিনছো, তার কেমন লাগবে ?'

'তোমার যদি পছন্দ হয়, তাহলেই হলো।'

তারা দোকান থেকে প্যাকেটটা নিয়ে থিয়েটার হল সংলগ্ন রেস্টুরেন্টে এসে বসেছিলো।

পাশের টেবিলেই বসেছিলো পরিবারের লোকজনের সঙ্গে তার একজন ছাত্রী।

সেদিনের সবকিছু তার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। ছাত্রীটি অবশ্য স্কুলেও এ-খবরটা কাউকে জানায় নি যে মিস বিমলার একজন বয়ফ্রেণ্ড আছে, যার চোখ দু'টি নীলচে এবং মাথার চুল কোঁকড়ানো। পুষ্পা সরকারের নামে যে সব কলঙ্ক রটেছিলো, তা কিন্তু রটিয়েছিলো ছাত্রীরাই।

অকারণেই বিমলা ছাত্রীটির সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো খুড়তুতো ভাই হিসেবে। বেড়াতে এসেছে।

সে দিনের সব কিছু তার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। সে কোনদিন আর সেই হোটেলটায় যায়নি। উচ্চবিত্ত মানুষরাই সাধরণত সেই হোটেলে থাকে। আচ্ছা, লাল রঙের সেই কুশনগুলি কি এখনও সে-রকমই আছে ? এখনও কি সেই এক-ই রকম ভাবে অতিথিদের সুন্দর পাত্রে সাজিয়ে আইসক্রীম্ দেওয়া হয় ?

থিয়েটার হলের ভেতরটা লোকের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে বেশ গরম হয়ে উঠেছিলো।

তারা বসেছিলো একদম শেষ লাইনে পাশাপাশি গদি আঁটা চেয়ারে। মুক্তো আহরণকারী ডুবুরিদের নিয়ে ছিলো ছবিটা। হাওয়াই দ্বীপের মেয়েদের নিরাবরণ বক্ষে একটি নাচ ছিলো। কেবল তাদের গলায় ছিলো ফুলের মালা। যখন নায়ক সেই মেয়েদের ভেজা লাল ঠোঁটে চুমু খাচ্ছিলো, তখন তারাও দৃঢ়ভাবে হাতে হাত রেখে সেই দৃশ্য উপভোগ করছিলো।

'ভাগ্যবান পুরুষ।'

তার কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে সে বলেছিলো। তার নিশ্বাসে সিগারেটের গন্ধ ভেসে এসেছিলো।

বোর্ডিং হাউসের সামনে তাকে বিদায় জানাবার সময় সে তার হাতে সদ্য কেনা সোয়েটারের প্যাকেটটি তুলে দিয়েছিলো।

তারপর,

'এটা তোমার জন্যেই।'

বিমলা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো। সে উপহারটি চেয়েছিলে ফিরিয়ে দিতে।'

'আমি—আমার জন্য—?'

কিন্তু সে তার মুখের কথা শেষ করতে পারেনি।

'তোমার জন্যেই এটা আমি কিনেছি। গুড্‌নাইট।'

বোর্ডিং হাউসে একাকী ফিরতে ফিরতে সে ঘন ঝোপে শব্দরত ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে গুন্‌গুন্‌ করে বলছিলো—

'ধন্যবাদ। সব কিছুর জন্যই তোমাকে ধন্যবাদ।'

বিকেলের সোনালী রোদ্দুর ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছিলো আঙিনায়। সে জানলা খুলে দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলো। দু'জন কুলি বাক্সপেটরা নিয়ে ঢুকছিলো 'গোল্ডন নূকে'। সেবার মরস্তুমের ভ্রমণকারীরা একটু আগেই আসতে শুরু করেছিলো।

গত বছর সপরিবারে দিল্লির একজন ইঞ্জিনীয়র এসেছিলেন এখানে। তাদের নয়টি সন্তান ছিলো সঙ্গে, যাদের বয়স তিন থেকে ষোলর মধ্যে।

যতদিন তাঁরা সেখানে ছিলেন, ততদিন দারুণ হৈ-চৈ শোনা যেতো সেখানে।

এর আগের বছর এসেছিলেন এক ব্রাহ্মণ দম্পতি—হানিমুনে।

বাইরের আবহাওয়া হঠাৎ তাকে কেমন যেন অস্থির করে তুললো। ঘরে বসে সময় কাটানোর বাসনা ত্যাগ করলো মুহূর্তের মধ্যে।

রাস্তায় তার দেখা হলো অমর সিংয়ের সঙ্গে। সে বাজার থেকে ফিরছিলো। নমস্কার করে অমর সিং তার হাতে একটা চিঠি দিলো।

বিকেলের ডাকে তার জন্য আরেকটি চিঠি।

অস্থির হৃদয়ে সে চিঠিটি খুললো। আচ্ছা, রেশমী বাজপেয়ী লিখেছে। অমর সিং তাড়াতাড়ি তাকে সেলাম করে চলে যাবার কারণ বুঝতে অসুবিধা হলো না তার। দেশী মদের গন্ধ তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিলো।

হাঁটতে হাঁটতে সে চিঠিটা পড়ছিলো।

'শ্রদ্ধেয় ম্যাডাম,

গতরাতে আমি বাড়ি পৌঁছেছি। পথে কোন অসুবিধা হয়নি। বাবা অপনাকে ধন্যবাদ জানাতে বলেছেন।'

ঠিকানা লেখা আছে রামনগরের।

পোস্ট অফিসের ছাপ হচ্ছে হালদানির। সে মনে মনে একটু হাসলো! হালদানি!

সে রেশমীর চোখে জয়ের দীপ্তি কল্পনা করে নিলো। হালদানির রেস্ট হাউসের বেয়ারাকে এই চিঠিটা পোস্ট করতে দিয়েছিলো নিশ্চয়ই পরদিন সকালে বাস স্ট্যাণ্ডে যাবার আগে।

আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম রেশমী। তুমি আজীবন স্মরণ করার মতো একটি রাত্রির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছো।

বিমলা সোজা পথ ছেড়ে নিচের একটা রাস্তা ধরে চললো। অবহেলিত একটি রাস্তা—পাশের ঝোপ-ঝাড়ে বাঁদররা কিচির মিচির করছে।

দানবের বিচূর্ণ মাথার খুলির মতো পরিত্যক্ত একটা পাথরের মাথায়

গিয়ে সে বসলো। সেখান থেকে লেকের বাঁ পাশটা স্পষ্ট দেখা যায়।

হোটেলের এঁকে বেঁকে ওঠা সিঁড়িগুলিও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে। চত্বরে কে যেন দাঁড়িয়ে। আকাশের নিচে একক নির্জন চেহারা। হোটেলটির এর মধ্যে মালিকানা ও চেহারার পরিবর্তন হয়েছে তিনবার। কিন্তু গোলাকার থাম এবং লোহার ফ্রেমে তৈরি বেতের চেয়ারের কোন পরিবর্তন হয়নি। বছর কয়েক পরে রেশমীও যখন হালদানির সেই রেস্ট হাউসের সামনে দিয়ে বউ এবং মা হয়ে হেঁটে যাবে, তখন চাপা আনন্দে একবার সেই ঘরটার জানালার দিকে তাকাবেই। তার প্রথম পাপ, তার প্রথম নারীত্বের আবরণ ছিন্ন করা তীক্ষ্ণ বেদনা, তার প্রথম উচ্ছ্বাস, তার প্রথম স্বর্গসুখ।

চারতলার ডানদিকের চত্বরে যাবার ঘোরানো সিঁড়ির সংলগ্ন ঘরটার জানালা কি এখান থেকে দেখা যাচ্ছে?

ছয়

লাল কার্পেটে ঢাকা মেঝে। সিগারেটের ধোঁয়া এবং পল এঙ্কার মৃদু কোমল স্বরে বাতাস ভরপুর।

দরজাটা ঠেলা দিয়ে খোলামাত্র চেয়ারে আরামরত লাল ডোরাকাটা গেঞ্জি পরা যুবকটির চোখে-মুখে অবিশ্বাস ও বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠলো।

'কি আশ্চর্য! তুমি?'

'কেন?'

'আমি ভেবেছিলাম, তুমি আসবে না।'

একটা বেতের চেয়ার তার দিকে এগিয়ে দেওয়া হলো।

'বসো।'

তার চোখ ঘরটার চারদিক খুঁজে বেড়াতে লাগলো। কার্পেটের ওপর এলোমেলো কয়েকটি রেকর্ড। টেবিলে স্তূপীকৃত বই। আলনায় চামড়ার খাপে ভরা ক্যামেরা।

রেকর্ডের গান শেষ হলো এই বলে:

'হাতে রাখো হাতখানি,
ঠোঁটে রাখো ঠোঁট।'

যুবকটি লেকের ভাসমান নৌকায় বা পাইন গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বা 'প্রেমিকের সরণি' ধরে হাঁটতে হাঁটতে অবিরাম কথা বলে যেতো। সর্বত্রই বিমলা থাকতো প্রায় নিশ্চুপ।

কিন্তু এখন, যুবকটি নিশ্চুপ, শব্দের মালা গাঁথায় কোনও উৎসাহ নেই।

তারও তেমন কিছু বলার ছিলো না। মনে হচ্ছিলো, যেন গলায় কিছু একটা ভারী জিনিস আটকে আছে। রেকর্ড প্লেয়ারের পিনটা

যখন কর্কশ শব্দে থেমে গেলো, তখন মনে হলো যেন এই স্তব্ধতার পরি-সমাপ্তি ঘটবে।

যুবকটি কিছু বললো। অর্থহীন, কিন্তু অনেক ইঙ্গিতবহ। কণ্ঠস্বরে কেমন যেন রুক্ষতা। তবু হাসলো—ভান করা হাসি।

যুবকটি তার হাত মুঠোর মধ্যে তুলে নিলো। রক্তিম হয়ে উঠলো তার মুখ। তার শরীরের অসংখ্য নাড়ীর মধ্যে দাপাদাপি শুরু করলো অজানা ভয়। মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত।

'এসো।'

বন্ধ জানালার কাচ ভেদ করে আসা মৃদু আলোয় সে যখন চোখ বন্ধ করে শুয়ে, তখন যুবকটির সুদক্ষ আঙুলগুলি তার জ্বলন্ত শরীরে সোহাগে এলোমেলো ঘুরছিলো। জলের মধ্যে ডোবা পাথরে ধাক্কা লাগলে যেমন বুদ্‌বুদ্‌ ওঠে, তেমনি একটি অভিজ্ঞতাই শুধু বাদ ছিলো। সে জানতো, তাও হবে ....

'না, প্লিজ। আমি পারবো না।'

খুব ক্ষীণ শোনালো তার কণ্ঠ।

'ও! তেমন কিছু না।' তার চোখ দু'টো খুলতে চেষ্টা করে। সব কিছু কেমন যেন ঝাপসা মনে হলো তার।

বেদনা। ঠোঁট চেপে শুয়ে বেদনায় মোচড় দিতে লাগলো। দুহাতে চেপে ধরলো সেই যুবকের শরীর তার বুকের ওপর।

না। আমি চেঁচিয়ে উঠবো না। যখন আমার যা ছিলো, সব দিয়েছি, তখন এই মুহূর্তে আমি চেঁচিয়ে উঠবো না।

একটা উপত্যকার মতো ছিলো তার মন, যেখানে জমাট কুয়াশা ক্রমাগত নেমে আসছিলো। কেবল আমার....যখন তুমি আমার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে বলে স্থির করেছো, তখন নিশ্চিত আমি কাঁদবো না।

যখন এক যুগ পরে সে তার চোখ মেললো, তখন তার ভেজা ঠোঁট মুছে দিলো যুবকটির গালে।

'খুব লেগেছে তোমার ?'

সে কোনও উত্তর দিলো না। আমি কাঁদতে পারি, আমি হাসতে পারি। তার শরীর বঙ্কিমান। চলতে ফিরতে ভয় করছিলো তার। চোখ বন্ধ করে শুয়ে শুয়ে সে মে মাসের নির্মল আকাশের এখানে সেখানে ছড়ানো তারকারাজি দেখতে পেলো। দূরে, অনেক দূরে, কারও শাদা রুমাল স্বাধীনভাবে উড়ে চলার মতো পথভ্রষ্ট একখণ্ড শাদা মেঘকে আকাশে ভেসে যেতে দেখলো।

বিছানা থেকে নেমে রেকর্ড প্লেয়ারটার দিকে যেতে গিয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করল। নগ্ন শরীর ঢাকবার জন্য লেপটা টেনে নিলো। তাকিয়ে দেখলো, বিছানার চাদরে রক্ত-বিন্দু লেগে আছে।

'নারীকণ্ঠে গান চলছিলো ঃ 'সুন্দর দিন আর নির্জন রাত।'

যখন যুবকটি তাকে আলিঙ্গন করবার জন্য পাশ ফিরলো, তখন দেখা গেল তার বুকে দর্‌দর্‌ ঘাম ঝরছে।

'বিমলা।'

সে আরো শুয়ে থাকবার জন্য চঞ্চল চোখের পাতা জোর করে বন্ধ করে রেখেছিলো। অনেক কথা সে বলতে চাইছিলো তাকে। কিন্তু কথারা তার বুকেই জমাট বেঁধে থাকলো। তার গলা শুকনো লাগছিলো।

নিজের কাছেই আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে গেলাম।

তার কম্পমান ঠোঁটে কথারা যেন স্থবির হয়ে গেলো। তার শরীর মনে হলো যেন নিস্তেজ ও কামনাহীন। আকাশে ভেসে চললো যেন এক টুকরো মেঘের মতো স্বত্ববিহীন রুমাল। ঢালু উপত্যকার দিকে এলোমেলো ভেসে যেতে থাকলো....।

॥ সাত ॥

লেকের কোণে রাস্তায় জ্বলন্ত বিদ্যুৎ বাতিগুলো হঠাৎ তার দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হলো। দিনের আলো এখনও পুরোপুরি নিভে যায়নি।

তার পেছনে গুন্ গুন্ করে আসতে আসতে হঠাৎ কে যেন সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেলো। সে পিছন ফিরে তাকালো।

'মেমসাব!'

হলুদ নোংরা দাঁত বের করে হাসিতে বিগলিত ছেলেটিকে চিনতে মাত্র এক মুহূর্ত সময় লাগলো তার। বুদ্ধু।

'মেমসাব! আজ লেকে আসেন নি কেন?'

'এমনি।'

'আপনি কি এখানে প্রতিদিনই বসেন?'

'কখনো-কখনো।'

'মেমসাব! আপনি প্রতিদিন লেকে আসেন না কেন? আমাকে ত্রিশ পয়সা করে দিলেই চলবে।'

'ঠিক আছে।'

সে উঠে দাঁড়ালো।

'মরসুম আরম্ভ হয়ে গেছে মেমসাব। আজ একটা স্পেশাল বাস এসেছে দিল্লি থেকে।'

এ-রকমই হয়। প্রতিদিন লোক আসতে শুরু করে। তারপর এক সময় শোনা যায়: মরসুম আরম্ভ হয়ে গেছে। তারপর সহসা এই পার্বত্য শহর জেগে ওঠে।

'তারা সব দেশী লোক।'

কোনও বিদেশী পর্যটক না আসায় কি বুদ্ধু হতাশ হয়েছে?

'বুদ্ধু! এখানে কি করছো?'

'নৌকার একটা বৈঠা ভেঙে যাওয়ায় আন্নুর বাড়ি যাচ্ছি একটা পুরোনো বৈঠা যোগাড় করতে।'

নিচের চীনা শৃঙ্গের দিকে সে হাত তুলে নির্দেশ করলো। বিমলা হাঁটতে শুরু করলো। বুদ্ধু জিজ্ঞেস করলো:

'আপনি চলে যাচ্ছেন মেমসাব?'

'হ্যাঁ।'

'আমার জন্য চলে যাচ্ছেন মেমসাব?'

'না। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।'

বুদ্ধু তার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চললো।

'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, মেমসাব?'

'কি?'

'আচ্ছা, লোকে বলে সাহেবরা সকলেই এ-দেশ ছেড়ে চলে গেছে। এটা কি সত্যি?'

সে বুদ্ধুর চোখে-মুখে একটা চিন্তিত ভাব লক্ষ্য করে কোন রকমে হাসি চেপে রাখলো।

'না বুদ্ধু। ওরা সব মিথ্যে কথা বলে।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। কেউ আমাদের এই সুন্দর দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে?'

সন্তুষ্ট হয়ে সে আবার গুন্ গুন্ করতে করতে চলে গেলো।

কংক্রিটের সিঁড়ির কাছে ফুটপাথে পড়ে পড়ে অমর সিং নাক ডাকছে। নিচের একটা দোকানে যে সস্তা মদ পাওয়া যায়, আবার সে তা গিলেছে। এক সপ্তাহ ধরে সে এভাবে জীবন উপভোগ করছে। আশ্চর্য, মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া বকশিসে তার এতদিন চলে!

ছুটির সময়েই কেবল অমর সিং এরকম স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। রেসিডেন্ট টিউটর হবার পর বিমলাই এ-নিয়মটা চালু করেছে। অন্য সময়ে মদ খেতে হলে অমর সিং মালীকে তার জায়গায় রেখে এক

সঙ্গে ছুটি নেয়।

বেশি মদ গিললে আবার ওর বিমলার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি বেড়ে যায়। পরিমাণ মতো খেলে সে কেঁদে কেঁদে আপন মনেই তার বিগত জীবনের ইতিহাস বলে যেতে থাকে। কিভাবে তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে গেছে, তার ছেলে কিভাবে লাথি মেরে তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে, এবং কিভাবে তার জামাই মেয়েকে খুন করে জেল খাটছে। যদি মাতাল না হয়, তাহলে ফুটপাথে খোলা জায়গায় সে ঘুমোয়।

একবার রেসিডেন্ট টিউটর বারান্দার থামগুলোর পাশে খুঁজতে এসে অমর সিংকে কোথাও দেখতে পেলো না। একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে সে দেখলো, অমর সিংয়ের কোট এবং পাজামা লোহার বেড়ার উপর ঝুলছে। কেবল যখন সে তাকে ডাকলো, তখনই বুঝতে পারলো : অমর সিংয়ের জামা-কাপড় নয়, অমর সিং নিজেই লোহার বেড়ার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘরে পা দিয়েই সে দেখলো চাপাটি আর তরকারি খাবার টেবিলে সুন্দর সাজানো। ফ্লাস্ক ভর্তি গরম দুধ।

পাহাড়ী উৎরাই অতিক্রম করায় বেশ গরম লাগছিলো তার। গা থেকে সোয়েটার খুলে সে জানালাটা খুলে দিলো। 'গোল্ডেন নূকে' আলো ঝল্ মল্ করছে। সে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো।

কে যেন বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে আছে। হাতের চেটো দিয়ে সে কেবল মাথাটা চেপে ধরেছে। তার জানতে ইচ্ছে হচ্ছিলো, সে বছর 'গোল্ডেন নূক' কাকে গেস্ট হিসেবে বরণ করেছে। একজন শিখ ভদ্রলোককে। সর্দারজীকে। মনে হচ্ছিল, বেশ বয়স্ক।

মাথার পাগড়িটা ছিলো তার কোলে। মাথার পাকানো চুলের ছায়া সামনের উঠোনে পাহাড় চূড়োর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। তাকে মনে হচ্ছে যেন গতিহীন, যেন একটা মৃতদেহ বসে আছে চেয়ারে।

কয়েক মিনিট পর প্রতিমূর্তিটি চলতে শুরু করলো। যখন সে মাথা তুলে পেছনের দিকে ঝুঁকলো, তখন বিমলা জানালাটা বন্ধ করে

পেছন দিকে সরে গেলো।

সে একতারার শব্দ শুনতে পেলো—শুনতে থাকলো। সেই ব্যক্তিটিই কি এটা বাজাচ্ছে? কী অপূর্ব দক্ষতায় তারের উপর আঙুল ওঠা নামা করেছে লোকটার।

তার বিছানাটা সাপের শরীরের মতো ঠাণ্ডা।

নিশ্চয়ই সর্দারজীর কণ্ঠস্বর। কর্কশ····

সে শুনতে থাকলো।

'উড্ডি উড্ডি ভেথিলে আর কাগা
লম্বি লয়ি ভে উদরি।
যা আখেঁ মার নাহি নো
গোরী নামোঁ ক্যাওঁ বিসরি॥'

এটা একটা পুরোনো পাঞ্জাবী লোকসঙ্গীত।

বিমলা এখন অবেলার রোদ্দুরে ভূট্টা খেতের পাশ দিয়ে হেঁটে চলা একজন ক্লান্ত পাঞ্জাবী তরুণীর ছবি মনে মনে আঁকতে সমর্থ হলো।

তার অবশ্য লম্বা-চওড়া, মুখে দাড়ি, মাথায় জট পাকানো এবং মুখে সব সময় লেগে থাকা পেঁয়াজের গন্ধ সম্বন্ধে কিছুটা বিরূপ মনোভাব ছিলো। তারও ভয় ছিলো বিমলাকে, কিন্তু বিমলা তার গান খুব পছন্দ করে। আগ্রায় কলেজ-জীবনে তার এক পাঞ্জাবী বান্ধবী ছিলো, অমৃতা। সে তাকে অনেক পাঞ্জাবী প্রেমের গান শিখিয়েছিলো। সেগুলি মনে হয়, পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলে গেঁয়ো ছোকরাদের চোখে প্রতিভাত দিবাস্বপ্নের মতো।

তার ঘরের দেওয়ালের ওদিকে কর্কশ শব্দের গান এবং একতারার বাজনা বেজে চলেছে।

'দিলকা টুকরা মাই কাগজপাগাভম্
উমগলিয়া কাত্তা কানি
আখাঁ দা কাজলা মেইঁ শাহি বনভম
হাস্থুয়াঁ দা পেনি অ পেনি।'

বিমলা লক্ষ্য করলো, তার চোখের পাতা ভিজে গেছে।

কালো পাখি! উড়ে যাও দূরে। আমার প্রিয়াকে জিজ্ঞেস করো, কেন সে তোমাকে ভুলে গেছে।

সে নিজেকে ভৎর্সনা করলো। একত্রিশ বছরের এক মহিলার লোকসঙ্গীত শুনে এভাবে অভিভূত হওয়া উচিত নয়।

অনেক দূরের গ্রামে হারিয়ে যাওয়া মেয়েটির কণ্ঠস্বর এখনও তার কানে প্রতিধ্বনি তুলছে ঃ

দিলকা টুকরা মাই কাগজপাগাভম্

আমার হৃদয়ের একটা টুকরোকে কাগজ হিসেবে ধরা যাক, আঙুল-গুলো কেটে তৈরী করা যাক কলম, চোখের জলের সঙ্গে কাজল মিশিয়ে কালি, তোমাকে আমার ভালোবাসার বার্তা জানাবার জন্য।

সর্দারজীর আঙুলগুলি যেন তার হৃদয়-বীণার তারে ওঠা নামা করছে। অন্য দিকে মন দেবার জন্য বিমলা কিছু পড়তে চাইলো। বইয়ের তাক খুঁজে সে একটা কবিতার সংকলন বের করলো। মলাট ছেঁড়া—বইটা বেশ পুরানো। প্রথম পৃষ্ঠাতেই বেগনী রঙের কালির সই। সুধীরকুমার মিশ্র, জানুয়ারী ১৯৫৫।

অনেক কটি লাইনের নিচে বেগনী কালির দাগ কাটা। বিমলা প্রায়ই তাকে সে-সব আবৃত্তি করতে শুনতো।

> 'I am dying my own death
> and the death of those after me.
> I am living my own life
> and the lives of those after me.'

এক তারের যন্ত্র একতারার সুর এখনও ঠাণ্ডা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

'গোল্ডেন নূকে'র অতিথি সর্বদাই কোনও না কোনও ভাবে তার ঘরটিকে প্রভাবিত করে। গত বছর তার আঙিনা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কলরবে মুখর ছিলো। তার দু'বছর আগে হানিমুনে আসা সেই

দম্পতির অবস্থানের নির্জনতা। বধূর কপালে সিঁদুরের টিপ এবং সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা। একমাস ছিলো তারা। দিন রাত তারা প্রায়ই দরজা বন্ধ করে থাকতো। কদাচিৎ তারা বের হতো। জানালা দিয়ে দেখা যেতো, তাদের ছায়া কখনও একসঙ্গে মিশে যাচ্ছে, আবার কখনও ছাড়া-ছাড়ি হচ্ছে। বাইরে থেকে তাদের কোনও আওয়াজ শোনা যেতো না।

বরফ ঢাকা নন্দাদেবী পাহাড়ের চূড়ো দেখবার জন্য আসা অসংখ্য মানুষের মধ্যে তারা দিব্যি এক মাস একে অন্যকে দেখেই কাটিয়ে দিলো। হয়তো এটা তাদের পক্ষেই সম্ভব। তাদের বন্ধ চার দেওয়ালের মধ্যে হয়তো ছিলো তাদের একটা নিজস্ব সুন্দর জগৎ।

একবার একজন বৃদ্ধ লোক এবং একটি সতের আঠার বছরের মেয়ে কিছুদিন এখানে কাটিয়েছিলো। বিমলা ভেবেছিলো, বোধ হয়, বাবা আর মেয়ে। কিন্তু অমর সিং এর গোপন রহস্য আবিষ্কার করে জেনে-ছিলো, মেয়েটি বৃদ্ধ লোকটির স্ত্রী।

পুষ্প সরকার এই ঘরটির কুখ্যাতি করে গেলেও 'গোল্ডেন নূকের জীবনে কোনও ছাপ পড়েনি। কতো বিচিত্র মুখের মেলা যাওয়া-আসা করতো সেখানে।

সর্দারজীর সঙ্গীত থামলো।

সে কি একা ?

সে কি তরুণ না বয়স্ক, সে কি সম্পূর্ণ একা ?

একা....একা'....

॥ আট ॥

আপনি কি কখনও হিমেল রাতে হিমালয়ের ঢালু জায়গায় একাকী রাত্রি যাপন করেছেন? এক নির্জনতা থেকে আরেক নৈশ নির্জনতায় অবগাহনের প্রতীক্ষা ছাড়া আর কি থাকতে পারে? নভেম্বরে এবং মে মাসে বাড়ির জানালা দরজা সব বন্ধ থাকে—অবচেতন কাঠের দেওয়ালে ঠাণ্ডা গরমের কোনও অনুভূতির প্রকাশ ঘটে না। ঘুমের মধ্যে হঠাৎ রাতে যদি আপনি জেগে উঠে জানালা খুলে বাইরে তাকান, তাহলে পৃথিবীর কোনও দৃশ্য চোখে পড়বে না। না আকাশ, না নক্ষত্র। না পৃথিবীর ছায়া। হয়তো কখনও জ্যোৎস্না রাতে গাছের ডালপালাগুলোকে আবছা মলিন প্রতিভাত হয়। জানালায় লেগে থাকে কুয়াশার রঙ, কাচের ভেতর দিয়ে সব কিছু আবছা, পৃথিবী ছাড়িয়ে কিছু দেখতে পারে না মানুষের চোখ।

I am dying my own death
and the deaths of those after me....
I am living my own life
and the live of those after me....

একতারার শব্দ শুনতে শুনতে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

।। নয় ।।

পরের দিন সকালে বারান্দার থামগুলোর পাশে দাঁড়াতেই বিমলা শুনতে পেলো অমর সিংয়ের কণ্ঠস্বর। সে দেখতে পেলো সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সর্দারজী কথা বলছে অমর সিংয়ের সঙ্গে।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে যতো বয়স্ক মনে হয়েছিলো সর্দারজীকে, ঠিক ততো বয়স্ক নয় সে। চল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে তার বয়স। তার মলিন মুখে চামড়ার কুঁচকানো দাগ। চোখে অনেক রাত জেগে থাকার ছাপ। কপালের অর্ধেকটা জুড়ে ক্ষতের কালো দাগ। প্রথম দর্শনে তার চেহারা দেখে বিমলা বেশ বিরক্ত হলো। ঘরে ঢুকবার জন্য সে পা বাড়ালো।

'নমস্তে টিচারজী।'

বিমলা ঘুরে দাঁড়ালো।

'নমস্তে।'

'আপনার পাহারাদার বলে যে আপনি খুব পড়াশুনা করেন।'

বেশ বিরক্তির সঙ্গে বিমলা অমর সিংয়ের দিকে তাকালো। সকাল বেলায় বারান্দা ঝাড় না দিয়ে সে বিমলার রুচি নিয়ে অপরিচিত একজনের সঙ্গে আলোচনা করছে ?

বিমলা হ্যাঁ বা না, কিছুই বললো না।

'যদি কিছু মনে না করেন, আমাকে কিছু পড়তে দেবেন। আমি কিছু বই নিয়ে এসেছিলাম সঙ্গে। কিন্তু এই তিন দিনের মধ্যে সব পড়া হয়ে গেছে।'

বিমলার ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। শুধু কিছু কথার জন্যেই সে বললো —

'আমার অতি সামান্যই বই আছে।'

'কিন্তু আমি যা পাই, তাই পড়ি। আয়ুর্বেদ বিষয়ক পুস্তক তালিকা, রেলের সময়-তালিকা, এমন কি টেলিফোন ডাইরেক্টরি, যে কোন জিনিস।'

বিমলা না হেসে পারলো না।

সর্দারজীর পরণে ছিলো একটা ঢিলা জামা ও নীল প্যাণ্ট, তার তুলনায় অনেক বড়। কথা বলার সময় মাড়ি বেরিয়ে পড়ে এবং খুব কুৎসিত দেখায়।

'দেখবো।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে বিমলা গেলো রান্নাঘরে। এখনও ব্রেকফাস্ট তৈরি হয়নি। বারান্দা ধরে সে দেওয়াল পর্যন্ত এগিয়ে গেলো। খিলান থেকে সে দেখতে পেলো অমর সিং ও সর্দারজী বাগানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। সর্দারজী একটা ফুলগাছের উপর অদ্ভুতভাবে হাত বুলাচ্ছে।

গত দু'সপ্তাহ বিমলা কোনও চিঠির উত্তর দেয়নি। একগাদা চিঠি জমে আছে ড্রয়ারে।

আজ সে উত্তর লিখবেই।

প্রিয় শান্তা,

তুমি বিয়ে করছো শুনে খুবই খুশি হলাম। আশা করি, বিয়ের তারিখটা আমাকে জানাবে।

পূজনীয়া মা,

আমি এখানে ভালো আছি। আশা করি, তোমরা সকলে বাড়িতে কুশলে আছো।

প্রিয় শিরিন্,

এক মাস যাবৎ আমি রোগে শয্যাশায়ী। তাই উত্তর দিতে দেরি হলো।

তাক থেকে সে কয়েকটা বই বের করলো। তিনটা উপন্যাস, একটা একজন শিল্পীর জীবনী এবং আরেকটা হলিয়ুডের জনৈক নায়কের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি।

পুরোনো নকশা কাটা আখরোট কাঠের ট্রের উপর সাজিয়ে অমর সিং মাখন মাখানো রুটি ও কফি নিয়ে এলো। টেবিলের ওপর ট্রেটা রাখবার জায়গা করে দেবার জন্য বইগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে অমর সিং জিজ্ঞেস করলো—

'এই বইগুলি কি সর্দারজীর জন্য ?'

'হ্যাঁ, এগুলি ওকে দিয়ে আয়।'

'লোকটা খুব ভালো। হিন্দি ও পাঞ্জাবী—দু'ভাষাতেই কথা বলতে পারে। যখনই আমার সঙ্গে দেখা হয়, জিজ্ঞেস করেঃ 'তুমি অমর সিং না ?'

'সর্দারজী কি তোকে আগে থেকে চিনতো ?'

'মনে হয়, আঠার উনিশ বছর আগে এই কটেজটায় ছিলো। সে কথা এখনও সর্দারজী বলেন।'

'হুঁ।'

বিমলা যদি একটু আগ্রহ দেখায়, তা হলেই অমর সিং তার যৌবনের অনেক কথা বলতে শুরু করবে। যৌবনে কেমন পালোয়ান ছিলো সে, ঝগড়া করতে গিয়ে কিভাবে ছুরিকাহত হয়েছিলো, রামলীলায় কিভাবে শ্রীরাম মহারাজের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলো, এবং আরো অনেক কিছু।

'সর্দরজীকে বড়লোক মনে হয়, বিবিজী।'

বিরক্ত হলো বিমলা। 'তুই কি ওর অ্যাকাউন্টেণ্ট ?'

'তা নয় বিবিজী। সর্দারজী দিল্লী থেকে এসেছে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে। বাসে এলে মাত্র আট টাকা লাগতো। তা না করে সে তিনশ' টাকা খরচ করেছে।'

'বড়লোকেরা যেভাবে খুশি খরচ করুক। আমাদের এ-সব নিয়ে ভাবনার কি দরকার!'

বিমলা তাকে ডাকটিকিট কেনার পয়সা দিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দিতে চাইলো।

কিন্তু অমর সিং প্রতিবারের মতোই বললো:

'আমাকে চিঠিগুলো দিন, বিবিজী। আমি টিকিট লাগিয়ে পোস্ট করে দেবো। তাহলে দু'বার যেতে হবে না।'

সে অমর সিংকে বহুদিন ধরে চেনে। অমর সিং চিঠিগুলি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দেবে। তারপর টিকিট কেনার পয়সায় ভাঙ বা গাঁজা কিনে খাবে। সকলে তার এই স্বভাবের কথা জানলেও, তাতে অময় সিংয়ের কিছু এসে যায় না। বিমলা দরজা বন্ধ করে দিয়ে চিঠি লিখতে বসলো। বাধা এলো বাইরে থেকে। অমর সিং তাকে ডেকে বলছে—

'বিবিজী! তাড়াতাড়ি আসুন।'

বাইরে খাকী পোশাক পরা সারা গায় কম্বল মোড়া পিওন অপেক্ষা করছে।

'আপনার টেলিফোন এসেছে, বিবিজী!'

পিওন পরিষ্কার করে দিয়ে বললো:

'ট্রাঙ্ককল এসেছে।'

বুকের ভেতরটা তার দুরু দুরু করতে লাগলো। কয়েক মিনিট স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে গেলো এবং একটা চাদর গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

'অমর সিং! দরজা খোলা রইল কিন্তু।'

'ঠিক আছে বিবিজী। আপনি কি নিজেই টিকিট কিনে আনবেন?'

তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে বিমলা দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

নিচের সমতল রাস্তায় নেমে সে তার চলার গতি কিছুটা শিথিল করলো। তার জীবনে কিছু ঘটতে যাচ্ছে। অবশেষে কিছু ঘটতে যাচ্ছে তার জীবনে।

অনেক, অনেক দূর থেকে একজন পরিচিত মানুষের কণ্ঠস্বর যেন সে

শুনতে পাচ্ছে। পোস্ট অফিসের পাবলিক টেলিফোন ঘরে ঢুকে সে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। রিসিভারটা অলসভাবে তুলে নিলো হাতে। তার মন প্রশান্ত।

'কে বলছেন?'

বাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেলো: 'আমি বাবু, দিদি।'

'হুঁ....কখন?'

'আজ ভোরে। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ।'

পোস্ট অফিসের বাইরে পাথরের রাস্তায় সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। সকালের উষ্ণ রোদ্দুর। উজ্জ্বল হাসিখুসি সকাল। পর্যটক-দের পক্ষে স্বর্গ। তার পেছনে বাসের গর্জন।

কয়েক মাস জড়োসড়ো হয়ে কতো তাড়াতাড়ি জেগে উঠেছে জায়গাটা? দলে দলে ট্যুরিস্ট, ভূটিয়া কুলিরা শকুনের মত তাদের মালপত্র নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে, সাইকেল রিক্সার চালক আর হোটেলের দালালরা গলা ছেড়ে চিৎকার করছে।

হ্যাঁ, ভোরে সাড়ে পাঁচটায়।

আমার কিছু হয়নি।

শব্দ আর রঙের বুদ্‌বুদ্‌ তার চারদিকে ভেসে যেতে থাকলো। হাজার নতুন মুখ। এর মধ্যে এক জোড়া চোখ একজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, যার সঙ্গে নয় বছর আগে দেখা হয়েছিলো। গাঢ় কালো চোখ, অসংযত ভুরুর নিচে দুটি গভীর নীল সমুদ্র।

বুদ্ধু কোথায়? গেঞ্জি পরা টেকো মাথা লোকটা কি ইউরোপীয়? জেটির মাঝিদের মধ্যে কি সেই ছেলেটা আছে, যার পকেটে রয়েছে একজন সাহেবের ছবি। সে কি প্রতিটি লোককে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করছে?

বিমলা হাঁটতে আরম্ভ করলো।

হায়, আমার নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে!

চোখ থেকে এক ফোঁটা জলও পড়লো না আমার।

সে লক্ষ্য করলো, তার পদক্ষেপেও কোনও জড়তা নেই। দুঃখের বহমান নদী তার অন্তরে কোনও খাঁজ কাটতে পারছে না।

আজ ভোর সাড়ে পাঁচটায় আমার বাবা মারা গেছেন।

তার মনে হয়েছিলো, খবরটা শুনে নিজেকে স্রোতে ভাসমান এক খণ্ড তৃণের মতো অসহায় মনে হবে।

কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কিছুই হয়নি। কেবল একটা শান্ত স্তব্ধতা বিরাজ করছে তার মনে।

'গোল্ডেন নূকে'র বাঁকে একটা ঝোপের পাশে সর্দারজী দাঁড়িয়ে আছেন। তার চোখ দু'টি খুশিতে ডগমগ।

'কে আজ আপনার অতিথি, টিচারজী?'

বিমলা সঠিক বুঝতে পাবলো না।

'আপনার পাহারাদার বললো যে, আপনার ট্রাঙ্ককল এসেছে। কে আসছেন?'

মৃত্যু, মৃত্যুই আমার অতিথি। চিৎকার করে কথাগুলো সে বলতে চাইছিলো।

বিমলাকে চুপ করে থাকতে দেখে সর্দারজী খুব মজা পেলো। তার চোখে দুষ্টুমির ছায়া ফুটে উঠলো।

বিমলা সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকালো। বলতে গিয়ে যাতে তার গলা না কেঁপে যায়, সে বিষয়ে সাবধান হয়ে বললো—

'কেউ আসছে না। একজন চিরকালের জন্য আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। আমার বাবা।'

পোস্ট অফিস থেকে ফেরার সময় প্রতি মুহূর্তেই সে ভাবছিলো, যে শক্তি সে এতক্ষণ ধরে সঞ্চয় করেছে, তা এক মুহূর্তেই উবে যেতে পারে। তার দৃষ্টির পেছনে, সে লক্ষ্য করলো, কোমল শিকড় প্রসারিত হচ্ছে। নিজেকে সাবধান করলো সে: না আমি কিছুতেই কাঁদবো না।

মনে হলো, যেন অনেক সময় কেটে গেছে বাড়ি ফিরতে।

॥ দশ ॥

সে ভেবেছিলো, অনেকেই আসবে তাকে সান্ত্বনা দিতে। বাড়ির বারান্দায় পা দিতেই তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেলো। একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আলফ্রেড গোমেজ। সুন্দর ইস্ত্রি করা ছাই রঙ স্যুট পরে রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে সে দাঁড়িয়ে ছিলো। সোনালী রঙের পাইপে সিগারেট জ্বলছিলো তার হাতে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো যেন নাচঘর থেকে মুক্ত বাতাস সেবনের জন্য বেরিয়ে আসা একটি মানুষ। সহানুভূতি প্রকাশের চেষ্টায় সে হেসে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বললো। বিমলা খুব বিরক্ত হলো তাতে। তার সহানুভূতি বিমলার অসহ্য।

সে দুঃখ প্রকাশ করতে এসেছে। অথচ এটা তার সুবর্ণ দিন।

বড় ঘরে ঢুকে বিমলা খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। যেন তার মাথায় একটা পুরো মৌচাকের মৌমাছিরা ঝট্পট্ করছে। চার পাঁচজন লোক মাত্র সেখানে। এক কোণে দাঁড়িয়ে বাবু আঙুল চুষছে।

খাবার টেবিলের ওপর তার ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে বিমলা তার নিজের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সব কিছু অপরিষ্কার। মৌমাছির ভন্ ভন্ শব্দ বিরতিহীন তার মাথায় চলছে।

অস্পষ্ট আলোয় সে দেখতে পেলো, দেওয়ালে হেলান দিয়ে মা বিছানায় বসে আছেন। কয়েকজন মহিলা বসে আছেন তাকে ঘিরে। কেউ অভিভূত নয়। সর্বত্র মলিন হাসি। ঘরের ঘনীভূত আবহাওয়া শুধু আলোড়িত। অনিতা এলো এবং কাঁদতে কাঁদতে তার গায়ে ঢলে পড়লো। যখন অনিতার চোখের জল গাল বেয়ে তার ঘাড়ে এসে পড়লো, তখন বিমলা সহানুভূতির স্বরে বললো: কাঁদিস না, লক্ষ্মীটি।'

কয়েকজন মহিলা তার সঙ্গে কথা বলতে এলো। কিন্তু তাদের

কথার কোনও উত্তর দেবার মতো ভাষা সে খুঁজে পেলো না।

একজন বাবুর ঘাড়ে হাত রেখে তার কাছে এসে বললে: 'বিমলা এসো।'

সেই লোকটি মালয়ালমে কথা বলছিলো। তা শুনে প্রভূত স্বস্তি পেলো বিমলা।

তিনি মিস্টার মেনন।

'কেরালায় কি টেলিগ্রাম করবো?'

'আমি জানি না।'

'কিন্তু লাভ কি? সেখান থেকে কারও আসতে পাঁচদিন লাগবে। ততোদিন অপেক্ষা করা অসম্ভব।'

মিস্টার গোমেজ এগিয়ে এলেন সেদিকে।

'কি করা যায় মিস্টার মেনন?'

মিস্টার মেনন তাকে তেমন পাত্তা দিলেন না। শ্রীমতী মেনন জানেন, তার মায়ের সঙ্গে গোমেজের সম্পর্কের কথা। বোধ হয়, মিস্টার মেননও তা শুনে থাকবেন।

'আমরা কি আর কারও জন্য অপেক্ষ করবো, বিমলা?'

কার জন্য অপেক্ষা?

শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়ে গেলো। মিস্টার গোমেজ সকলের শেষে সেখান থেকে গেলেন।

যখন তিনি মার কাছে এলেন বিদায় নিতে, তখন বিমলা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। নির্দ্বিধায় তিনি মা-কে সন্ত্বনা দিয়ে যান।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে রান্নাঘর থেকে বেরোনো জল জমে থাকার গর্তটা দেখছিলো। অনিতা তার কাছে এসে দাঁড়ালো। শেকলে বাঁধা কুকুরটা তার পা চাটছে।

'আমি তবে যাই, মিস বিমলা।' গোমেজের কণ্ঠস্বর।

সে মাথা নাড়লো।

সে অনুভব করলো, অনিতা ভেজা চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

এই উপত্যকাভূমির চারদিকে ছোট ছোট টিলার উপর আলু গবেষণা কেন্দ্রের ঘরগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সবচেয়ে বড় ঘরটিতে কাজ করতেন তার বাবা। লাল চারচালা ওই ঘরটায় বসে তিনি বহু বছর একটানা রাজত্ব করে গেছেন।

রাত্রির কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমলা খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো।

সেই রাতে বাবার শোবার ঘরে কেউ ঢুকলো না।

বীর বাহাদুর রাতের খাবার যথারীতি সাজিয়ে রেখে গেলো টেবিলের ওপর।

কিন্তু সে রাতে কেউ খেলো না।

তারা সকলেই একটা ঘরে শুয়েছিলো। বাতি জ্বলেছিলো সারা রাত।

অনিতা সারা রাত তাকে জড়িয়ে শুয়েছিলো। যতোটা দুঃখে, তার চেয়ে বেশি ভয়ে।

একটা বিষণ্ণ এবং ঘুমহীন রাত্রি যাপন করতে হবে, এই মনে করে বিমলা বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু গভীর ঘুমে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো কিছুক্ষণ পরেই।

কুয়াশার আবরণ ছড়িয়ে পড়েছিলো সর্বত্র। তরঙ্গ, কুয়াশার মৃদু তরঙ্গ এখানে-সেখানে ছোটাছুটি করছিলো।

ভেসে—না ভেসে নয়—একটা হাঁসের মতো চেহারার নৌকা বেয়ে সে এগিয়ে চলছিলো।

হ্যাঁ, বুদ্ধুই নৌকা বাইছিলো। কথা বলতে বলতে বুদ্ধুর চেহারা পাল্টে গেলো। সুন্দর দাড়ি গোঁফ কামানো একটু সবুজের আভায় উজ্জ্বল পোশাক পরিচ্ছদে—এ বুদ্ধু নয়।

মুখে নীল শিরা দেখা যাচ্ছে। অসংযত চুল ছড়িয়ে পড়েছে কপালে।

'না, ওখানে নৌকা চালিও না।'

'কেন?'

'ওখানে একটা গভীর ঘূর্ণীস্রোত আছে। তোমার কিছু পয়সা দিতে হবে ওখানে।

'পয়সা খরচ করার অনেক উপায় আছে।'

'বলা হয়, যারা ভগবানে বিশ্বাস করে না, তারা ওখানে ডুবে যায়।'

'তুমি কি মরতে ভয় পাও?'

জীবন সর্বত্র পূর্ণ বিকশিত। মরার কথা কে ভাবে!

এমন কি যখন নৌকাটা সেই ঘূর্ণীস্রোতে পড়ে ঘুরপাক খেতে লাগলো তখনও বুদ্ধুর চোখে কোনও ভয় দেখা গেলো না। বুদ্ধুর মুখ আবার পাল্টে গেলো। এ আর বুদ্ধু নয়। যার মুখে নীল শিরা দেখা যাচ্ছিলো, সেই লোকটি।

ঘুরন্ত নৌকাটি মনে হলো আকাশ স্পর্শ করছে। সহসা উপরে—আরো উপরে—।

ওঃ, মা—!

'বিমলা!'

'মা, তুমি কি আমাকে কিছু বললে?'

'এ রকম করছো কেন?'

'কিছু নয়।'

হঠাৎ তার চোখের পাতা ভিজে এলো। মাকে বুকে জড়িয়ে ধরবার প্রবল বাসনা হলো তার।

সে আবার চোখ বন্ধ করলো। বাবু ঘুমের মধ্যেই অর্থহীন কি-সব কথা বলে যেতে লাগলো।

অনিতা যেন আরো জোরে তাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে।

বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে সে দেখলো, সকালের প্রথম বাস ছেড়ে দিয়েছে···নিচে পথের পাশের দোকানগুলোর সামনে কিছুক্ষণ থামবে

বাসটা। এখনও সূর্য ওঠেনি।

পরের বাসটা ছাড়বে সাড়ে আটটায়। এয়ার-ব্যাগে সব গুছিয়ে বের হচ্ছে দেখে মা জিজ্ঞেস করলেন :

'কি করতে যাচ্ছো ?'

'আমি চলে যাচ্ছি।'

'অন্তত এখন ক'দিন থেকে গেলে হতো না ?'

বাবুর কথায় রাগের ভাব ফুটে উঠলো। সে কোনও উত্তর দিলো না। রান্নাঘর থেকে বীরবাহাদুর বেরিয়ে এলো এবং তার জিনিস-পত্র নিয়ে এগিয়ে চললো। অনিতার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো।

বাস ছাড়লে সে যেন স্বস্তি পেলো। সে তার নিজস্ব জগতে ফিরে যাচ্ছে।

তার নিজস্ব জগৎ। শুষ্ক, রৌদ্রদগ্ধ দূরের পৃথিবী থেকে আসা পর্যটকদের প্রতিটি পদক্ষেপের শব্দ সে শুনতে পায়, যা তার জগতে পাহাড়, উপত্যকা, কুয়াশা, হ্রদের জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে ঢুকে পড়ে। তার গোরস্থানের চারদিক ঘিরে পদশব্দ।

ল্যাম্পপোস্টগুলো সেখানে উজ্জ্বল সবুজ। ফুটপাথ থেকে রাস্তার এপাশ ওপাশ শাদা কালো দাগ কাটা।

লেকের পাশে দাঁড়ালে শোনা যায় ঘোড়ার খুরের শব্দ, চীনা শৃঙ্গে যাবার সময় যখন ট্যুরিস্টরা যায় সেই সময়ের।

লেক এবং রাস্তার মাঝখানের সবুজ দ্বীপের মাঠটায় বসে বিমলা এক ঝাঁক হাঁসের জলে ভেসে চলা দেখছিলো। তাদের দিকে ট্যুরিস্টরা যে-সব বাদাম ছুঁড়ে মারছিলো, তা খাবার জন্য কাড়াকাড়ি করছিলো হাঁসগুলি। বোটে যেতে যেতে একজন তাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো :

'শুভদিন, মিস।'

বুদ্ধু। ওর হাসি মুখের হলদে দন্তপাটি দেখা যাচ্ছে। ওর নৌকায় একটি মেয়ে ও দুটি কম বয়সী ছেলে। মেয়েটির কানে বড় রিং। তারা

ঘুরে বিমলার দিকে তাকালো।

'মরসুম আরম্ভ হয়েছে, মেমসাব!'

'মে ফ্লাওয়ারে'র পেছনটা জলে ধাবমান ধূমকেতুর মতো লাগছিলো।

একজন কালো টেকো মাথার লোক ঘাড়ে ক্যামেরা ঝুলিয়ে শিস্ দিতে দিতে তার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর দৃষ্টি যেন বল্লমের মতো তাকে ভেদ করে প্রসারিত।

সেখান থেকে উঠে গেলো বিমলা।

রাস্তা পেরিয়ে আয়তক্ষেত্রাকার দুটি ঘাসের চত্বরের মধ্যবর্তী পথ ধরে সে চললো। অনেকদিন পর এ-পথ দিয়ে সে যাচ্ছে। শহরে ট্যুরিস্টদের ভিড় হলেও এই পথ, পথের পাশের বড় বড় পাথর চূড়া খুব ফাঁকা থাকে।

কত তাড়াতাড়ি মানুষের আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যায়। এক সময়, প্রেমিক-প্রেমিকারা এ-পথেই বেশি ঘুরে ফিরে বেড়াতো।

একটা উঁচু জায়গায় গিয়ে সে কয়েক মুহূর্তের জন্য দাঁড়ালো। কিছু একটা দেখতে চেষ্টা করছিলো সে। একটা মন্দির। মন্দিরের প্রায় অর্ধেকটা ছনের ঝোপে ঢাকা পড়ে গেছে। লোহার খুঁটির উপর ঝোলানো বিরাট পেতলের ঘণ্টার নিচে বসে পুরোহিত হুঁকা টানছে। মন্দিরের দেবতার উদ্দেশে এক সময় লোকে অনেক পয়সা দিতো। পুরোহিত নিশ্চয়ই যে মেয়েটা এখানে এসে লাভারস রক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলো, তার উদ্দেশে অভিসম্পাত করে। মন্দিরটা যেন ঘুমিয়ে আছে, মন্দিরের দেবতাও ঘুমিয়ে আছেন।

তার পেছনে দাঁড়িয়ে কেউ যেন মন্দিরটা দেখছে, সে অনুভব করলো এবং পেছন ফিরে তাকালো।

সর্দারজী দু'হাতে তার বুক চেপে দাঁড়িয়ে। তার বিবর্ণ মুখ কেমন যেন রক্তিম হয়ে উঠেছে।

'বুড়োর দিন শেষ।'

তাকে দেখে হেসে উঠে জিজ্ঞেস করলো সর্দারজী:

'আপনি কি উপরে উঠবেন, টিচারজী?'

'হ্যাঁ।'

'আমিও যাবো। একটু দম নিতে দিন।'

তার সাহচর্য বিমলার পছন্দ নয়। বিশেষ করে যেখানে অনেক পুরোনো স্মৃতি নির্জনে ঘুমিয়ে আছে, সেখানে এমন একজনের সাহচর্য। কিন্তু সে কিছু বললো না।

বিমলা হাঁটতে আরম্ভ করলো। সর্দারজী তাকে অনুসরণ করতে লাগলো। জঙ্গলের মধ্যে একটা শতাধিক বছরের পুরোনো গাছের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সর্দারজী তাকে জিজ্ঞেস করলো:

'আপনি কি ওই গাছটা দেখতে পাচ্ছেন, মিস বিমলা? বেশ কয়েক বছর আগে ওর ছায়ায় যেন ফুলের কার্পেট বিছানো থাকতো। আপনি শুনেছেন সেই গল্পটা? মানে সেই গল্পটা, যাতে বলা হয়েছে, বছরে একবার গর্ত থেকে বের হয়ে এখানে ভগবানের সাপ আসে।

বিমলা মাথা নাড়লো।

'যখন মানুষ ভগবানকেই তোয়াক্কা করে না, তখন তার সাপ নিয়ে কে আর মাথা ঘামাবে? হুঁ....।'

সেই পাহাড়টার কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত সে আর কথা বললো না। সর্দারজী সেই চড়াই পথে হাঁস-ফাঁস করতে করতে এবং এদিক ওদিক চাইতে চাইতে উঠছিলো। যখন সে পাহাড়টার উপরে গিয়ে উঠলো, তখন ঘেমে একদম জ্যাবজাবে।

'ক্ষমা করবেন, মিস বিমলা। আমি একটু বসলুম।'

সর্দারজী বসে পড়লো। বিমলা নিচের উপত্যকার দিকে তাকিয়ে রইলো। বিকেলের বাতাসে তার আঁচড়ানো চুল এলোমেলো উড়ছে।

'বসুন, মিস বিমলা।'

বিমলা পাহাড়টার উপর একটা গোলাকার বসবার জায়গায় বসে পড়লো। তার পেছনে কালো পাথর একটা বিকৃত টাওয়ারের মতো মুখ বের করে পড়ে আছে।

'আপনার বাবার বয়স কত হয়েছিলো, টিচারজী ?'

'আটান্ন।'

'হুঁ। আমি কিন্তু আপনাকে সহানুভূতি জানাচ্ছি না। কে, কাকে সহানুভূতি জানাতে পারে ?'

নিচের আবছা কালো কুটিরগুলো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বিমলা সর্দারজীর দিকে তাকালো। যে লোকটা তার পাশে বসে পাকা দাঁড়িতে হাত বুলোচ্ছে, তার চোখ দুটি দেখে মনে হলো, সে যেন বিমলার অন্তরের নির্জনতম স্থান পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে।

'মৃত্যু হচ্ছে এমন একজন ভাঁড়, যার মঞ্চকলা সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই। কি বলেন, টিচারজী ?'

বিমলা বেদনার হাসি হাসলো।

'আমি কখনও এ সম্বন্ধে ভাবিনি।'

'কিন্তু একথা সত্যি। আপনি একথা একজন অচেনা চিন্তাবিদের এলোমেলো উক্তি হিসেবে উদ্ধৃত করতে পারেন।'

কথাগুলো বলেই সর্দারজী বেশ জোরে হেসে উঠলো। যেন নিজেকে নিয়ে বেশ মজা করা গেলো একটা।

সর্দারজী উঠে দাঁড়ালো এবং অসমতল জায়গাটায় হাঁটতে থাকলো। এর মধ্যে অনেক নাম মুছে গেছে। ছেনি দিয়ে ক্ষোদাই করা একটা নামের উপর হাত বুলোতে বুলোতে সে বললো : 'কী ভালো, আমিও আগে আমার নাম এখানে ক্ষোদাই করে রাখতে পারতাম।'

বিমলা উৎসুক হয়ে উঠলো। কেন ? সে তার ঘাড় উঁচু করে তাকালো।

'আমি সেদিকে এখন তাকাতাম না। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে জিজ্ঞেস করি, এখানে আপনার প্রথম আসার স্মারক চিহ্নটি কোথায় ?'

সে কোনও উত্তর দিলো না....মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

বিষয়ান্তরে যাবার জন্য সর্দারজী বললো: 'কেন আত্মহত্যার জন্য লোকে এমন স্থান বেছে নেয়, যা আগে থেকেই কারো সঙ্গে দেখা হবার জন্য নির্দিষ্ট থাকে? বোধহয়, যেখানে জীবনের বিকাশ, বিনাশের জন্যও তা প্রশস্ত। আপনি কি আসামের কাছে মাদারিহাটে কখনও গেছেন? সেখান থেকে দু'মাইল দূরে এমনি একটি পাহাড় আছে। কতো যে প্রেমিক প্রেমিকা তাদের নাম সেখানে ক্ষোদাই করে রেখেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কেউ কেউ আবার হৃদয়ে ধনুক বিদ্ধ হবার প্রতীক চিহ্নও এঁকে রেখেছে।'

বিমলা ঘাড় নেড়ে দেখালো যে সে তার কথা শুনছে। সে অনুভব করলো, কথা বলতে সর্দারজীর খুব ভালো লাগছে।

'পাহারটার কাছে একটা রেস্ট হাউস আছে। সেখানে যদি কখনও এক রাত কাটান, তাহলে শুনতে পাবেন অরণ্যের সঙ্গীত। হ্যাঁ, অরণ্যের নিজস্ব সঙ্গীত আছে। বৃষ্টি এবং বাতাসেরও নিজস্ব ভাষা এবং সঙ্গীত আছে।'

হাঁফিয়ে উঠে সে তার বুক হাতের চেটোয় চেপে ধরলো এবং আস্তে বিড়্ বিড়্ করে বলতে লাগলো: 'আরেকবার সেখানে আমি যেতে চাই। কিন্তু জানি না, আমার অভিভাবক তা অনুমোদন করবেন কিনা।'

'মানে—?'

'যে সব জায়গায় আগে কখনও গিয়েছিলাম, সেই সব জায়গাগুলিই ঘুরে ফিরে আবার দেখছি। যেমন ভাবে হেড কোয়ার্টারের চীফ অ্যাকাউন্টেন্ট বছর শেষে জমা-খরচের খাতা পরীক্ষা করতে যান।'

যখম সর্দারজী হেসে ওঠেন, তখন মনে হয় যেন বয়সের ভার তার শরীর থেকে নেমে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে। শিশুর মতো পবিত্র সেই হাসি।

'টিচারজী, আপনি কতদিন এখানে আছেন?'

'নয় বছর।'

'হুঁ। যখন প্রথম আপনি এই পাহাড়ে এসেছিলেন, তখন নিশ্চয়ই

আপনি একা ছিলেন না। ছিলেন কি ?' বিমলা কোনও উত্তর দিলো না।

'আমিও একা ছিলাম না। কিন্তু তা অনেক বছর আগের কথা।'

সর্দারজী মাথা নিচু করে চোখ বন্ধ করে কি যেন ভাবলো। তারপর বললো—

'আমি তখন তেইশ বছরের ছিলাম। আপনি কি জানেন, মানুষের জীবনের মধুরতম সময় কোনটি ? আমার কাছ থেকে জেনে নিন, তেইশ বছর।'

সর্দারজীর এর সমর্থনে একটা বক্তব্যও ছিলো। পঁচিশ বছর জীবনে একটা বাঁক নেবার সময়। এরপর নিজেকে পূর্ণ বর্ধিত মনে হয়। তেইশ বছর বয়সে মনে হয়, সামনেই ওই বাঁক নেবার সময় অপেক্ষা করে আছে। আঠার থেকে বাইশ, এর মধ্যে কৈশোরের কিছু অনুভূতি থেকে যায়।

'তেইশ। চমৎকার! যে ব্যক্তি আপনাদের নারী জাতিকে ষোড়শ বর্ষে একটি বিশেষণে ভূষিত করেছিলেন, হয়তো আমাদের পুরুষদের তেইশ বছরের কথাটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন।'

মুহূর্তগুলি আবার নির্জনতার স্রোতে ডুবে গেলো।

'আপনার কিছু বলার নেই, টিচারজী ?'

'বলার আর কি আছে ?'

'যা খুশি। আমার শুনতে ভালো লাগবে। আমি এতক্ষণ নিজের সঙ্গেই কথা বললাম। এখন আমি যা খুশি, তাই নিয়ে বলতে পারি.... পাহাড়, গাছ, ল্যাম্পপোস্ট...কথা বলতে পারাটা তো আশীর্বাদ। তাই নয় কী, টিচারজী ?'

'বোধ হয়।'

পাহাড়ের ঢালু জায়গায় ছায়ারা দীর্ঘতর হচ্ছে। নিচের গভীর গহ্বরে কুয়াশা নীল আবরণের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে।

'আমি একবার পাহাড়টার চূড়োয় উঠবো।'

বিমলা বাধা দিতে চাইছিলো। এমন একজন দুর্বল মানুষের পক্ষে

এতখানি খাড়া পথে ওঠা খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু সে কিছু বলতে পারলো না।

উপরে ওঠার জন্য সর্দারজী যেন সংগ্রাম করছিলো। বিমলা দেখতে পেলো, তার গালে রক্ত যেন ঠেলে উঠছে। এই প্রচণ্ড শীতেও তার মুখে প্রবল ঘাম।

চূড়ার সেই সূচাঁল প্রান্তে উঠে সে নিচের দিকে তাকালো। তার লম্বা ঢিলে প্যান্ট বাতাসে কাঁপছে। বিমলা ভয় পেলো, তার চোখের সামনেই পালকের মতো ভেসে যাবে লোকটা।

'টিচারজী!' বাতাসের মর্মরধ্বনি ছাড়িয়ে তার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'আপনি কি কখনও মৃত্যুর মুখ দেখছেন? দেখুন।'

আতঙ্কিত হয়ে বিমলা দেখলো, সেই পাহাড়ের সূচাল প্রান্তে সন্ধ্যার আবছা আলোয় হাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে সর্দারজী। তার পায়ের তলায় মৃত্যু হাঁ করে ওৎ পেতে আছে।

নেমে আসুন। চিৎকার করে বলতে চাইছিলো বিমলা, কিন্তু নিজেকে সংযত করে নিলো। নামার জন্য আরো বেশি চেষ্টা করতে হলো তাকে। বিমলার কাছে এসে দাঁড়ালো সর্দারজী। ফেরার পথে তারা কথা বললো না। সর্দারজী খুব আনন্দের সঙ্গে একটা পাঞ্জাবী প্রেমের গানের সুর ভাঁজছিলো। 'গোল্ডেন নূকে'র দরজায় এসে তারা থামলো।

'ধন্যবাদ।'

'কেন?'

'একটি সুন্দর সন্ধ্যা আমাকে উপহার দেবার জন্য। ধন্যবাদ আপনাকে, ধন্যবাদ পৃথিবীকে, ধন্যবাদ ঈশ্বরকে।'

একটি সুন্দর সন্ধ্যা! সর্দারজী কি তার সঙ্গে তামাশা করছে?

'আগামীকাল সন্ধ্যায় আপনি কি করবেন বলে মনস্থ করেছেন?'

'কিছুই ঠিক করিনি।'

'আপনার একটি সন্ধ্যা কি আমাকে ধার দেবেন? আজকের সন্ধ্যাটা ছিলো অপ্রত্যাশিত। কাল লেকে নৌকা করে একটু বেড়ানো যাবে।'

বিমলা অনুভব করলো, অচেনা এই লোকটি ক্রমশ তার উদারতার সুযোগ নিতে এগিয়ে আসছে। সে কিছুটা এগিয়ে গেলো। সর্দারজীও এগোলো সঙ্গে সঙ্গে।

'প্রতি সন্ধ্যা নয়, টিচারজী। শুধু কালকের সন্ধ্যাটি।'

'দেখবো।'

'আমি বোর্ডিং হাউসের ফটকে আপনার সঙ্গে দেখা করবো।'

বিমলা কোনও উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেলো বোর্ডিং হাউসের ফটকের কাছে।

'একটু সময়, প্লিজ।'

বিমলা হাঁটার গতি শিথিল করলো।

'মৃতের কথা ভেবে নিজেকে ক্ষয় করবেন না। পৃথিবীতে অনেক জীবন্ত জিনিস রয়েছে।'

অমর সিং একটা টিউব লাইট ঠিক করছিলো।

'অনেক দেরি হয়েছে, বিবিজী!'

'হুঁ।'

'নিচের রাস্তা দিয়ে একা হাঁটবেন না, বিবিজী।'

আলোটা জ্বলছে আর নিভছে।

'আপনি লেকে সন্ধ্যায় এমন কি মাঝরাতেও ঘুরতে পারেন। সেখানে ভয়ের কিছু নেই। কেননা, নৈনী দেবী সব সময় সেদিকে দৃষ্টি রাখেন।'

'ওই পাহাড়ে কি আছে?' জানার ভান করে জিজ্ঞেস করলো বিমলা।

'এটা মজা করার ব্যাপার নয়, বিবিজী। আপনি চন্দন সিংয়ের কথা শোনেন নি।'

বিমলা জানার জন্য খুব আগ্রহী নয়। কিন্তু অমর সিং এর মধ্যেই আরম্ভ করে দিয়েছে।

'ও একটা ভয়ানক শয়তান ছিলো। দুটি তলোয়ার সব সময় তার কোমরে ঝোলান থাকতো। প্রায় চল্লিশ বছর আগের ঘটনা হবে। ডাক-

বাংলো ময়দানের কাছে রামলীলা হচ্ছিলো। লোকটা একেবারে মাতাল হয়ে এসেছিলো। একটি ঘোমটা পরা মেয়েকে দেখতে পেলো সে বাংলোর গেটের সামনে। 'কে তুই?' জিজ্ঞেস করলো সে। মেয়েটি কোনও উত্তর দিলো না। কাছে গিয়ে সে মেয়েটির ঘোমটা টেনে খুলে দিলো। এক রাক্ষসী। এক ফুট লম্বা জিভ। দাঁত এ-রকম, এত বড়। দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে চোখ দুটি। একটা মাত্র গর্জন। তিন দিন পর বেচারা মারা গেলো।'

বলার সময় নানান অঙ্গ-ভঙ্গি করছিলো অমর সিং। সে ভুলে গিয়েছিলো যে এই গল্পটা সে আগেও একবার বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে তার ঠাকুর্দা কিভাবে প্রাণ হারিয়েছিলো, তা বলতে গিয়ে বলেছিলো।

সর্দারজী তার সব বই ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। উপরে একটা কাগজে লেখা ঃ

'ধন্যবাদ। বইগুলোর মধ্যে শয়তান আর দেবতাই কেবল দেখলাম। আপনার কাছে কি মানুষের চরিত্র নিয়ে লেখা কোনও বই আছে?'

সর্দারজীর হাতের লেখা খুব সুন্দর। লোকটার চেহারার সঙ্গে তার মিল নেই।

ওকে একটা অদ্ভুত জীব মনে হয়।

অনেক সময় ধরে তারা একসঙ্গে ছিলো। সর্দারজী অনেক কথা বলেছে, কিন্তু সাময়িক পরিচিতির সীমারেখা অতিক্রম করে যায়নি। নিজের সম্বন্ধে কোনও কথা বলেনি। বিমলাও জিজ্ঞেস করেনি।

মৃত্যু হচ্ছে এমন একজন ভাঁড়, যার মঞ্চকলা সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই। —অচেনা চিন্তাবিদ্।

মৃত্যু। শাদা বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত। হাড় বের করা মলিন মুখ। আধ বোজা চোখ।

পিচ ঢালা পথে ক্ষুরের শব্দ অনেক দূর থেকে অস্পষ্ট ভেসে আসছে। নিশাচর একটা পাখি বাগানের আলোর সামনে ডানা ঝট্‌পট্‌ করে

আবার অন্ধকারের ছায়ায় মিলিয়ে গেলো।

বিছানায় শুয়ে সে প্রার্থনা করতে চাইলো। দেওয়ালের জমাট হৃদয় ভেদ করে ভেসে এলো একতারার করুণ স্বর।.

॥ এগার ॥

বিকেলে ভ্রমণের আমন্ত্রণ পেয়েছে বিমলা। এই কথাটাই পরদিন সকালে তার মনে বার বার উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো। আমন্ত্রণ এসেছে যে কোনও ভাবেই হোক, একজন পুরুষের কাছ থেকে, যাকে দেখতে কুৎসিত এবং বয়সের তুলনায় যাকে বেশি বুড়ো দেখায়।

এমন একটা সময় ছিলো যখন সে সাজগোজ করে সন্ধ্যার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকতো। অন্যান্য মেয়েদের দিকে তাকাতো গর্ব আর অবজ্ঞার ভাব নিয়ে।

শাদা দাড়ির এক দিকে হাত বুলোতে বুলোতে সর্দারজী সন্ধ্যার সময় আসবে তার কাছে। ভাবতে গিয়ে তার না হলো আনন্দ, না ঘৃণা।

সন্ধ্যায় অমর সিং এসে ঘোষণা করলো : বিবিজী! সর্দারজী আপনাকে খুঁজছেন।' দাঁড়িয়ে থাকার আবেগ যেন বৃদ্ধি পেলো। উদ্বেগে কি মুহূর্তগুলি কাঁপছে?

বারান্দায় সে পায়ের শব্দ শুনতে পেলো। অমর সিং আসছে।

'বিবিজী, একটা চিঠি। সর্দারজী দিয়েছন।'

বিমলা পড়লো : 'আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার সঙ্গী অভিভাবক আজ আমাকে বিশ্রাম নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাকে অমান্য করা সম্ভব নয় আমার। ক্ষতি হলো আমারই।' নিচে কোনও সই নেই। একটা এলোমেলো দাগ।

কোনও অস্থিরতা নয়, পর্যটকের মতো লেকে 'নৌকা ভ্রমণ এবং বাইরে বেরাবার একটা শিশুসুলভ গর্ব জেগে উঠলো তার মনে।

জেটিতে প্রায় আধ ডজন নৌকা বাঁধা আছে। কোনও মাঝিই তার পরিচিত নয়। বুদ্ধু? বুদ্ধু আসুক। তার কাছ থেকে পঞ্চাশটি পয়সা পাক।

'মেমসাব! উঠে আসুন।' বিমলা মাথা নেড়ে এমন ভাব করবে যেন সে-ও একজন ট্যুরিস্ট। এই প্রথম এই লেকের সৌন্দর্য উপভোগ করতে এসেছে।

সবুজ চত্বরে এবং বালি ছড়ানো জায়গায় প্রচুর লোকের ভিড়।

থিয়েটার হল থেকে গান ভেসে আসছে। সিনেমার গান। মনে হচ্ছে যেন বেড়ালের মিউ মিউ আর কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক। 'পিকচার কার্ডস্। দু' টাকায় দশটা।' একজন বিক্রীওয়ালা তার কাছে এলো। তার মুখের দিকে তাকিয়েই তাড়াতাড়ি চলে গেলো লোকটি।

হয়তো লোকটা বুঝতে পেরেছে বিমলা মরসুমী ট্যুরিস্ট নয়।

কেমন করে? তার আধ পাকা চুলে, ভেজলিন মাখা কালো ঠোঁটে বা তার কালো চোখের তারায়—কোথাও কি এ-কথা লেখা আছে? পাহাড়ের থাম্ দিয়ে ঘেরা এক বন্দীশালায় বছরের পর বছর আবদ্ধ মনে হলো তার।

এইমাত্র জেটিতে ভিরেছে, এমন এমটি নৌকা থেকে কে যেন ডেকে উঠলো, 'মেমসাব! আসুন!' বুদ্ধু তাকে ডাকছে সেই কটা চোখ আর হলদে দাঁত বের করা হাসি নিয়ে।

যখন সে নৌকায় উঠে বসলো, তখন মন্দিরের পেতলের ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে।

মরসুমের জন্য 'মে ফ্লাওয়ার' নিজেকে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। ঠোঁট আর ডানায় যেন নতুন রঙ লাগানো হয়েছে।

'এবার মরসুমটা কেমন, মেমসাব?'

'ভালো।'

'অনেক লোক এসেছে এবার।'

'হ্যাঁ।'

'লেক হোটেলে অনেক সাহেব এসেছেন।'

বিমলা কোনও উত্তর দিলো না।

'মেমসাব! আপনার বাড়ি কি এখানেই?'

'না।'

'অনেক দূরে?'

'হুঁ।'

'মাদ্রাজে?'

বুদ্ধু এইভেবে হাসতে থাকলো যেন সে তার কোনও গোপন কথা জানতে পেরেছে। বিমলা মাথা নাড়লো। 'তার চেয়েও দূরে।'

'হাঁ—মাদ্রাজী টিচার। আমি তাদের কথা শুনেছি।'

'হুঁ।'

আপনি কি সেখানে যান?'

'হ্যাঁ।'

'কখন?'

'কখনো-সখনো।'

লেকের মাঝখানে আসার পর বুদ্ধু নৌকাটাকে ছোট বৃত্তের মতো একটু ঘোরালো। তারপর জোরে হেসে বললো: 'অনেক শাদা সাহেব এবার এসেছেন। কিন্তু আমি যাঁকে খুঁজছি, তাকে কোথাও দেখলাম না।'

বুক পকেটে যেখানে ছবিটা রাখা আছে, সেখানে একটু হাত বুলিয়ে নিলো বুদ্ধু।

'এবার সে আসবে, নিশ্চয়ই আসবে।'

আমরা সবাই প্রতীক্ষা করে থাকি। প্রতি বছর। এই শহরটাও প্রতীক্ষা করছে। এরই মধ্যে সময় প্রবাহিত হয়ে এগিয়ে চলে। বৈঠার ধাক্কায় বুদ্‌ বুদ্‌ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। তোর পকেটে একটা ছবি আছে, যার জন্য তোর প্রতীক্ষা। আর একজনের প্রতীক্ষার জন্য রয়েছে অস্পষ্ট নীল শিরা টানা একটা মুখ।

নতুন রঙ করা ল্যাম্পপোস্ট এবং শাদা-কালো রঙে রঞ্জিত ফুটপাত

নিয়ে প্রতীক্ষা করে আছে এই পার্বত্য শহরটি। কার জন্য, বুদ্ধু ?

বালক, তুই কি প্রর্থনা করিস ? তোর কি ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে ? তুই কি মন্দিরের শব্দরত ঘণ্টাধ্বনি শুনে উপরে তাকিয়ে দেখতে পাস, একাকী বসে আছেন নৈনীদেবী তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য ?

'আপনি কি কিছু বলছেন, মেমসাব ?'

'না।'

'আপনি কি ভাবছেন, মেমসাব ?'

'ভাবছি ··· '

ডাল লেকের একটি হাউস-বোটে একটি মেয়ে এসেছে আখরোট কাঠে তৈরী মূর্তি বিক্রী করতে। তার চোখ দু'টো ছিলো নীল, আকাশের চেয়েও নীল। না, এটা কোনও কবিতা নয়। আমি কোনও গল্প বলছি না। হৃদয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়ে যখন গল্প বেরিয়ে আসে, তখনই হয় কবিতা। কি যেন বলছিলাম ? হ্যাঁ, একটি মেয়ে। যেন আমার বহু দিনের স্বপ্ন জীবনে রূপ পেলো। আমি বহু বছর ধরে এমন-ই স্বপ্ন দেখছিলাম। আমি যখন মেয়েটিকে দেখলাম, রান্নার লোকটি তখন সে রাতের জন্য দশ টাকায় কিনে নিলো আমার জন্য—না, এ সব বলতে আমার খারাপ লাগছে না। আমি এই গল্প অনেক বন্ধুর সঙ্গেও করেছি। এখন আমার কোনও গোপন অতীত নেই। কেবল তুমিই আছো আমার সামনে। তোমার যা কিছু আছে, সবই আমার প্রিয়। তোমার শরীরের গন্ধ আমার চারদিকে সর্বদা অপরূপ মহিমা বিস্তার করে রাখে।—আমি কি যেন বলছিলাম ? রাতের সঙ্গী। আমার স্বপ্নের উপাদান আমারই সামনে। না, সামনে নয়, বর্শা-বিদ্ধ স্বপ্নগুলি আমার পায়ের তলায় স্তূপীকৃত।

বিছানায় দেহের সৌন্দর্য কিছুক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে যায়। এখন আমি তোমাকে সব বলতে পারি। আমি কিশোর প্রেমিক নই আর তুমি স্কুলে-পড়া অল্পবয়সী মেয়েও নও।

তুমি কি আরেকটা গল্প শুনতে চাও ? যদি একটু অশ্লীল হয়, কিছু

মনে করো না। আমি যখন কলেজের ছাত্র, তখন মনে হলো, পাড়ার একটি মেয়ের প্রতি আমি আসক্ত। রাতদিন কেবল তার কথাই ভাবতাম। তার দেহের বর্ণনা দেবো কেমন করে? তার মুখ? যে কোনও মূল্যে তাকে পাবার তীব্র বাসনা জেগে উঠলো মনে। আবার তোমাকে এমন কিছু বলছি, যা আমার না করাই উচিত ছিলো। তোমাকে বলিনি, যে মুহূর্তে তোমার সঙ্গে দেখা হলো, সেই মুহূর্তেই নিজেকে শুদ্ধ করে নিয়েছি? আঃ, বেচারা প্রতিবেশীনী! অনুরোধ, প্রশংসা। তারপর এক সুন্দর মুহূর্তে বাসনা চরিতার্থ হলো। যদি আমার বীজের একটি অংশও তার মধ্যে জীবিত হয়ে ওঠে? ওঃ, কিছু না—আমি সমস্ত পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ করতাম ও বলতাম: 'সে আমার।' যখন সে তার সর্বস্ব আমাকে দিয়েছিলো, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'ভয় পাচ্ছো?' তারপর উত্তর: 'আমি পর্দার আবরণে হৃদয় ঢেকে রেখেছি।' আমার স্বপ্নের মৃতদেহ।

তুমি কখনও আমাকে হতাশ করোনি। কাছে দূরে, বাইরে ভেতরে, তোমার পরিচ্ছদ, আমি তোমাকে পূজো করি।···

'মেমসাব!'

ও কিছু নয় বুদ্ধু। তোরও হয়তো বিদেশী বাবাকে পাবার সৌভাগ্য হবে, যদি আমরা আমাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে পারি।

সময়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে, বছর আর প্রজন্মের পর্দা ছিঁড়ে যদি আমরা সামনে উঁকি মারতে পারি, তাহলে বলতে পারবো: 'অমুক-অমুক একদিন, যে কোনও নামের এক রাস্তায়, একটা নির্দিষ্ট সময়ে, তুই তোর সাহেব পিতাকে দেখতে পাবি।'

এই দেখা হওয়াটা কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়, বিমলা দেবী। একুশ বছর বয়স্কা সুন্দরী বিমলা দেবীর সঙ্গে দেখা হলো এক উনত্রিশ বছরের ফিটফাট গোঁফওয়ালা অমিতব্যয়ী সুদর্শন পর্যটকের সঙ্গে ১৯৫৫ সালের মে মাসের সকালে এক বাসে। সময়ের বড় গ্রন্থে এ-কথা লিপিবদ্ধ আছে, আমাদের জন্মের আগে থেকেই। সেই মুহূর্তটিতে

পৌঁছবার জন্য আমার নিজের জায়গা ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। তোমার বাবা এজন্য বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলো। বিপত্নীক মিস্টার গোমেজ তোমার মায়ের প্রেমিক হয়ে উঠলেন এবং তার জন্য মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছো তুমি এবং নিজেই নিজের জীবিকা বহন করছো। সবই এ-কারণেই হয়েছে।

এটা কোনও মামুলি ঘটনা নয়, বিমলা দেবী। এটা এমন এক মহান মুহূর্ত, যেখান থেকে জীবনের পরিপূর্ণতার সূত্রপাত।

বুদ্ধু বৈঠা বন্ধ করে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। 'মে-ফ্লাওয়ার' লেকের পশ্চিম কিনারে লতানো গাছের পাশে ভাসছে।

'চল, এবার আমরা ফিরি।'

বুদ্ধু হলদে দাঁত বের করে হেসে নৌকা বাইতে শুরু করলো।

'মেমসাব! আপনার মন যেন অনেক দূরে চলে গেছে।'

'আমি ভাবছিলাম।'

'আমিও।'

'কার কথা, বুদ্ধু?'

'আমার মায়ের কথা।'

'তোর সাহেব বাবার কথাও।'

বুদ্ধু সেই এক-ই রকম বোকার মতো হাসলো।

'যখন সাহেবরা সব এ-দেশ ছেড়ে চলে গেছে, তখন কি আর তিনি এ-দেশে আছেন?'

হে বালক! আমরা শুধু ভবিষ্যতের দিকে উঁকি মারতে পারি। তার বেশি কিছু না।

'না, তিনি না-ও যেতে পারেন।'

'কেন?'

সে তোর মাকে ভালোবাসতো, তাই না? এই জায়গাটাও হয়তো তার পছন্দ। সুতরাং সে ফিরে আসবে···ফিরে আসবেই।

স্বাভাবিক কারণেই বিমলা ক্লান্তি বোধ করছিলো। আবার সেই

জেটি। কাঠের পুল। মৃত্যুদূতের মতো কুলিরা। সেই এক-ই পথ, যা সে বিগত নয় বছর ধরে চষে বেড়িয়েছে। আধো-ঘুমে ঢলে পড়া পাহারাদার। গমের রুটি আর ডাল। ঠাণ্ডা বিছানা।

সেই রাতে বিমলা একতারার অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেলো না। সে জানালা খুলে বাইরে তাকালো। 'গোল্ডেন নূকে' আলো জ্বলছে। কিন্তু একতারা ঘুমিয়ে আছে। সেই সঙ্গে ঘুমিয়ে আছে একটি পাঞ্জাবী মেয়ের হৃদয়, যে কিনা তার বহু দূরের প্রেমিকের কাছে কালো পাখির মারফত পাঠিয়েছে তার কুশল বার্তা। বিমলা জানালাটা বন্ধ করে দিলো।

যদি তাতে কিছু দেখতে পারা যায়।

॥ বার ॥

সকালের ডাকে দুটো চিঠি এলো। একটার হাতের লেখা বেশ পরিচিত। অনেকটা তার মতো। তার বোনের চিঠি। অলসভাবে শুধু চোখ বুলিয়ে নিলো চিঠিটার উপর।

'আমি আর এখানে থাকতে পারছি না। আমি কি তোমার ওখানে চলে আসবো এবং সেখানেই থাকবো? গতকাল বাবু রীতিমত মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরেছে এবং মার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। দয়া করে একবার বাড়ি এসো, নইলে আমিই চলে যাবো তোমার ওখানে।'

বিমলা এই চিঠিটাও অন্য চিঠির গাদার মধ্যে রেখে দিলো। অনিতার কি হয়েছে? প্রদীপচন্দ্র শর্মা কি সে জায়গা ছেড়ে চলে গেছে অন্য কোথাও? অথবা অনিতার মনে নতুন কোনও ভাবের উদয় হয়েছে?

বিকেলে অমর সিং এসে কিছু সময়ের জন্য ছুটি চাইলো। সে তার একজন অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে তিন চার মাইল দূরের একটি গ্রামে যাবে। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবে সে।

বারান্দার থামের পাশে দাঁড়িয়েছিলো বিমলা। 'গোল্ডেন নূক' থেকে হেঁটে সর্দারজী গেটের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো। বিমলা ভেবেছিলো, সে হয়তো নিচের দিকে নেমে যাবে। কিন্তু সে সোজাসুজি তার দিকেই এসে বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'গুড্ ইভিনিং।'

'গুড্ ইভিনিং।'

'কাল আপনার নৌকাভ্রমণ কেমন হলো?'

'আপনি কি করে জানলেন যে, আমি লেকে গিয়েছিলাম?' বেড়ার খুঁটির ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকা সর্দারজীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো বিমলা।

'আমি কি অনুমান করতে পারি না? একটা খোলা বইয়ের পৃষ্ঠার মতো আমি আপনার মনের সব কথা পড়তে পারি। আপনি সাধারণত ভিড় এড়িয়ে বেড়াতে ভালোবাসেন। যদিও কাল লেকে অনেক লোক নৌকা নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলো, তবু আপনি সেখানেই গিয়েছিলেন, যেহেতু আসবো বলেও আমি আসিনি। আপনার মনে একটা জেদ চেপে গিয়েছিলো। তাই অন্তত দশবার লেকটার এপাশ ওপাশ করবার বাসনা নিয়ে আপনি বেরিয়ে পড়েছিলেন।'

সর্দারজী চোখ তুলে তার দিকে তাকালো। 'আমি কি ঠিক বলিনি?' একটু থেমে সর্দারজী আবার বললো—

'একটা সিগারেট ধরাই। কেউ যেন দেখতে না পায়!'

'কেন?'

'আমার অভিভাবক যাতে জানতে না পারেন; আমার কথাটার অর্থ তাই।'

সিগারেটে একটা সুখ-টান দিয়ে সে বললো:

'আমার অভিভাবকের সঙ্গে আমার সব সময় ঝগড়া চলছে।'

'আমি কিন্তু আপনার অভিভাবককে এখনো দেখিনি।'

'আপনি তাকে দেখতে পারবেন না। ওটাই তার বৈশিষ্ট্য।'

আস্তে আস্তে সর্দারজী বেড়ার অন্যদিকে হেঁটে গেলেন। কথা বলার পক্ষে বেশ দূরত্ব।

'টিচারজী!'

শুনতে পেলো বিমলা।

'একটা মজার কথা বলবো আপনাকে।'

বিমলা দাঁড়িয়ে রইলো।

'আপনাকে আমার ভালো লাগে। যদিও কোনও কারণ নেই এর।'

বিমলা তার শুকনো মলিন মুখে এক ঝলক উজ্জ্বলতা দেখতে পেলো। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করলো বিমলা।

'ওঃ, এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি আপনার জন্য পথে ওত পেতে থাকবো না। কোনও প্রেম-পত্রও পাঠাবো না আপনাকে। ও-রকম কিছুই আমি করবো না। কোনও সম্পর্ক স্থাপনেও এগিয়ে আসবো না। আমি কেবল····আপনাকে খুব ভালো লাগে আমার।' শব্দের ফুলঝুরি। কোনও আবেগ বা আবেদন নেই তাতে। উত্তর পর্যন্ত প্রত্যাশা করে না। বিমলা হতচেতনের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

কিছু একটা বলতে চাইছিলো বিমলা। নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়েই সে বললো:

'আমি কে, তাও পর্যন্ত আপনি জানেন না।'

'হয়তো তাই। আপনার সম্বন্ধে অনেক খবর অন্যের কাছ থেকে আমি সংগ্রহ করতে পারতাম। পুঙ্খানুপুঙ্খ হাজার খবর। আমি যখন তার সব কিছু জড়ো করে এক জায়গায় রাখতাম, তখন তার থেকে আমার মনে গাঁথা আপনার ছবিটার উপর দিয়ে অসংখ্য শিকড়, ডাল, পাতা গজিয়ে উঠতো। আপনি তার মধ্যে একটা ফুটকির মতো থাকতেন। তার চেয়ে এটাই ভালো।'

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে তার ধোঁয়া আকাশে ছুড়ে দিলো সর্দারজী। আপনি কে? কোথা থেকে আপনি এসেছেন? সেই লোকটা, যার মুখটা সর্বদা শুকনো ও বিমর্ষ, কালো বিকৃত কপাল, মৃদু উজ্জ্বল চোখ! বিমলা তার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলো।

'আমার একটা অনুরোধ আছে, টিচারজী।'

শোনার জন্য নীরবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো বিমলা।

'আপনি মাঝে-মধ্যে হাসবেন। নাহলে ঈশ্বরের দেওয়া এই পবিত্র উপহারটির কথা ভুলে যাবেন।'

'আমি…আমি তো কাঁদি না।'

'আমি চোখের জলকে ঘৃণা করি। কিন্তু অন্যদের হাসতে দেখতেও আমার খুব খারাপ লাগে।'

সর্দারজী হাতঘড়ির দিকে তাকালেন।

'এখন ওষুধ খাবার সময়। আমি সত্যি আমার অভিভাবককে ভয় করি।'

বিমলা সর্দারজীকে খুব দ্রুত চলে যেতে দেখলো। লোকটা কি পাগল?

অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হতে থাকলো। বোর্ডিং হাউসের উঠোনে বিদ্যুৎ বাতি জ্বলছে। এই অন্ধকারে এত বড় বাড়িটায় একাকী থাকতে তার ভয় করছিলো। অমর সিংয়ের কি ফিরতে দেরি হবে? একটা একটা করে সে সব কটা বাতিই জ্বেলে দিলো।

ঘরে এসে তাকের বইগুলোর দিকে সে ফিরে তাকালো। সেই এক-ই পুরোনো জিনিস! অসহ্য….

আজ সারাদিন মাঝে মাঝেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়েছে। খুব ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। প্রায় গোলাকার ঘাসের চত্বরে দাঁড়িয়ে দূরের বরফ ঢাকা পাহাড়-চুড়োগুলিকে মনে হচ্ছিলো যেন তরঙ্গায়িত কুয়াশা। পাশের রাস্তায় মাত্র একবার ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গিয়েছিলো।

দুপুরের অনেক আগেই কুয়াশা সরে গিয়েছিলো। এটাই

স্বাভাবিক। লেকের উপরে কুয়াশা ঘোমটার মতো ছড়িয়েছিলো তারপর ঃ

সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা বাতাসে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পাহাড়ের গায়ে তীব্র শব্দে ছিটকে পড়েছিলো।

বহুদিন পর একতারার শব্দ আবার ভেসে এলো তার কানে। সঙ্গে সর্দারজীর ক্ষীণ কণ্ঠ।

জানালার একটা পাট খুলে সে ঠাণ্ডা বাতাসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। কুয়াশা ভেদ করে 'গোল্ডেন নূকে'র আলোয় ঝল্‌মল্ কাচের জানালাগুলো দেখতে পেলো সে।

উমগলিয়া কাত্তা কানি....

আখাঁ দা কাজলামেই'....

বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে একতারার শব্দ ভেসে চললো। প্রেমিক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত পাঞ্জাবী মেয়েটির চাউনি যেন শীতল বাতাসকেও অস্থির করে তুলেছে।

সর্দারজীর অভিভাবক কি ঘুমোচ্ছে ? কেন সে তাকে গান করতে দিচ্ছে ? বিমলা জানালা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়লো ঘুমোবার জন্য। সকালে কেউ যেন দরজায় ঠক্ টক্ করতে লাগলো। সে বিছানা ছেড়ে চমকে উঠলো।

'কে ওখানে ?'

'আমি বিবিজী।' সে দরজা খুললো। অমর সিং দাঁড়িয়ে।

'কি ব্যাপার ?'

'সর্দারজী আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাইছেন ?'

'এত সকালে ?'

'শুধু আপনার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য।'

রাতের জামা-কাপড় না ছেড়েই গায়ে একটা চাদর মুড়ে বিমলা বারান্দা ধরে হাঁটতে লাগলো। বাতসের ঠাণ্ডা আঙুল যেন তার নরম গালে আদর করছিলো। সর্দারজী ভোরের আবছা আলোয় তার জন্য উঠোনে অপেক্ষা করছিলো।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা করবেন, টিচারজী।'

'না-না। তা কিছু নয়।'

গভীর ঘুমের পর তার গলা যেন শুকিয়ে আসছিলো।

'আমি যাচ্ছি, টিচারজী।'

কি উত্তর দেবে ঠিক বুঝতে পারলো না বিমলা। শেষ পর্যন্ত বলে ফেল্‌লো :

'আবার দেখা হবে আমাদের।'

সর্দারজী হাসলো। 'আমি খুব নিশ্চিন্ত নই। খুব বেশি হলে আমার আর চার মাস আছে। আমার অভিভাবক তাই বলেন।'

তার ঘুম-ঘোর কেটে গেলো। সর্দারজী বলে চললো :

'এটাও আমার লাভ। এর জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ। ফুসফুসের ক্যান্‌সার রোগীর সময় সীমা এক বছর। আমি বোনাস হিসাবে আরো ক'টি মাস বেশি পেয়েছি।'

নিজের কথায় নিজেই হাসতে লাগলো সর্দারজী।

'গুড্‌বাই, টিচারজী।'

'গুড্‌বাই।'

ত্ব'পা এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়ালো সে। বিমলা নিশ্চুপ দাঁড়িয়েছিলো সেখানে।

'মনে রাখবেন, ধার করা সন্ধ্যেটা এখনও পাওনা আছে আমার। ভুলে যাবেন না কিন্তু।'

খুব জোরে শব্দ করে সর্দারজী হেসে উঠলো এবং এগিয়ে চললো সামনের দিকে।

কুলিরা তার মাল-পত্তর বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার অভিভাবকটি কোথায়?

বারান্দায় অমর সিংয়ের সঙ্গে দেখা হলো। তার মুখ প্রফুল্ল।

'সর্দারজী খুব ধনী লোক, বিবিজী। তিনি আমাকে দশ টাকার একটা নোট বখশিশ্‌ দিয়েছেন।'

'অমর সিং, ওর বন্ধুটি কোথায় ?'

'বন্ধু ? তিনি তো একাই ছিলেন, বিবিজী।'

বিমলা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

॥ তের ॥

ল্যাম্পপোস্টের পাশে মৃদু আলোয় দাঁড়িয়ে বিমলা লেকটার দিকে তাকিয়ে ছিলো। মেঘে ঢাকা আকাশের নিচে ঠাণ্ডা লেকটা যেন ঝিমোচ্ছে।

মন্দিরের ঘরগুলি, বালি ফেলা জায়গাটা, সবুজ মাঠ, সব-ই এখন ফাঁকা।

হাঁসের মতন দেখতে নৌকাটা তিনজন পাহাড়ী ছেলে সমেত তার দিকে এগিয়ে এলো। বুদ্ধু তার হলদে নোংরা দাঁত বের করে হাসছে। সে নৌকাটা কিনারে ভিড়ালো।

'মরসুম খুব তাড়াতাড়ি চলে গেছে। তাই না, মেমসাব ?'

'হ্যাঁ। ঠিক-ই বলেছিস।'

'কেউ আসেনি।'

'পরের বছরের জন্য আমরা অপেক্ষা করবো, মেমসাব।'

বিমলার উত্তর শোনার জন্য প্রতীক্ষা না করেই সে আবার বললো : 'হ্যাঁ, পরের বছরের জন্য।'

বুদ্ধুর মনে হলো, বিমলা যেন তার কথায় তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে না। মোটা চামড়া রঙের জ্যাকেটের নিচে তার বুক পকেটে রাখা ছবিটার উপর হাত চাপড়ে সে জোরে শব্দ করে বললো :

'তিনি আসবেন। তাই না, মেমসাব ?'

বিমলা মাথা নেড়ে তার কথা সমর্থন করলো।

নৌকাটা আবার জলে ভাসলো। লেকের জলে তার এগিয়ে চলার গতি লক্ষ্য করে বিমলা মনে মনে উচ্চারণ করলো :

'হ্যাঁ, হয়তো বা।'

সমাপ্ত